সত্যকথন ২
সন্দীপন

সত্যকথন ২

লেখকবৃন্দ

আসিফ আদনান, ড. সাইফুর রহমান, তানভীর আহমেদ, ডা. রাফান আহমেদ
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার
মিসবাহ মাহীন, জাকারিয়া মাসুদ, আশিক আরমান নিলয়, আসিফ মাহমুদ
মুহাম্মাদ মশিউর রহমান, মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

শারয়ী সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

সূচিপত্র

ভূমিকা

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। দরুদ ও সালাম নবি করিম ﷺ-এর ওপর, যাকে সত্যসহ প্রেরণ করা হয়েছিল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

একজন আলিম বলেছিলেন, 'একসময় মুশরিকরা idol (মূর্তি) পূজা করত। এখনকার মুশরিকরা ideology (মতাদর্শ) পূজা করে।' এছাড়া ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে 'ধর্মান্তর বা conversion' এর ধারণাটা সেভাবে নেই। আর যেকোনো এলাকার নাস্তিকরাই সংগঠিত হতে পারলে ওই এলাকার প্রভাবশালী ধর্মটাকে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ করতে শুরু করে। আর যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পায়, সেখানে রক্তের বন্যায় ধর্ম ও ধার্মিকদের ভাসিয়ে দেয়। অতীতে সোভিয়েত রাশিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে তারা এর সাক্ষর রেখেছে। মজার ব্যাপার হলো, তারা মুসলিমদের হীনম্মন্যতায় ফেলার জন্য শক্তিশালী অর্থনীতি কিংবা কম অপরাধের দেশগুলোকে দেখিয়ে বলে, 'ঐ দেখো, "নাস্তিক" দেশগুলো কত ভালো! মুসলিম দেশগুলো খুব খারাপ...।' ওদিকে 'নাস্তিক' দেশগুলো থেকে গণহত্যার উদাহরণ দেখালে তারা বলে, 'এর দায় নাস্তিকতার না, এর দায় অমুক মতাদর্শের!' এই হচ্ছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ ও ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের এক ঝলক।

বাংলাদেশে ইসলামের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণটা নাস্তিকদের মাধ্যমে অনেকদিন ধরেই হচ্ছে; যদিও এর বেশিরভাগ (কু)বুদ্ধিই খ্রিষ্টান মিশনারিদের থেকে অনুবাদ করে পাওয়া। মুসলিমরাও এগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ করেছে, তবে সেগুলো সুসংগঠিত না। ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানোছিটানো। তাই যে অভিযোগ করা হয়—'মোমিনরা কলমের বিরুদ্ধে কলম চালাতে জানে না, শুধু ভায়োলেন্স করে'—তা আসলে ভুল। মুমিনগণ বহু আগে থেকেই কলম, কীবোর্ড, কীপ্যাড, কণ্ঠ ইত্যাদি চালাচ্ছেন। আপনি দেখতে না পারলে বা দেখতে না চাইলে সেটা আপনার ব্যর্থতা।

ছড়ানোছিটানো জিনিস মলাটবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো আগের চাইতে কিছুটা হলেও গোছানো, সুসংগঠিত ও সুসংরক্ষিত হওয়া। এবং জনগণ এটা খুব করে চাইছিলও। তাই নাস্তিকতাবিরোধী বই লেখার ধারাটা শুরু হওয়ার পরপরই তা আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যাপক সাড়া ফেলে। আমাদের 'সত্যকথন' ফেসবুক পেইজের যাত্রা শুরু হয় ২০১৬ সালের নভেম্বরে। নাস্তিক-অজ্ঞেয়বাদী-সেক্যুলার কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের প্রত্যুত্তর ও ব্যবচ্ছেদ নিয়ে বাংলাদেশের বহু উদীয়মান ইসলামি লেখকের লেখাগুলো একে একে প্রকাশ হতে থাকে এই পেইজে। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে সত্যকথনের বাছাইকৃত লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় আমাদের প্রথম বই 'সত্যকথন'। এরই ধাবাহিকতায় আমাদের 'সত্যকথন' সিরিজের ২য় বই 'সত্যকথন ২'।

অমুসলিমরা একটার পর একটা আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করেই যাবে, আর মুসলিমরা সেগুলোর রক্ষণাত্মক জবাব দিয়েই যাবে—এটা দাওয়াহর আদর্শ পদ্ধতি নয়। যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা একের-পর-এক প্রশ্ন আনতেই থাকবে। এগুলোর প্রত্যুত্তরে বই লিখতে থাকলে বইয়ের লাইব্রেরি হয়ে যাবে, কিন্তু বিদ্বেষীদের প্রশ্ন তখনও শেষ হবে না। আর মানবীয় যুক্তিবুদ্ধি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। আস্তিক-নাস্তিক যে পক্ষের কথাই বলুন-না-কেন, দিনশেষে উভয়পক্ষের আর্গুমেন্ট-ই মানবীয় খণ্ডিত জ্ঞানের ভেতর সীমাবদ্ধ।

ইসলামের কিছু বিধান এমন আছে, যেগুলো অমুসলিম তো দূরের কথা, মুসলিমদের কুপ্রবৃত্তিই মানতে চাইবে না। এমনকি কিছু হুকুমের ব্যাপারে আল্লাহ তো জানিয়েই দিয়েছেন যে, এগুলো আমাদের অপছন্দ হবে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে সেগুলো পালন করতে হবে। 'আজকে এগুলো অমুসলিমদেরকে পছন্দ করিয়েই ছাড়ব'—এমন মনোভাব নিয়ে যদি কেউ নাস্তিকদের সাথে তর্ক শুরু করেন, তাহলে প্রবল সম্ভাবনা আছে যে, তার্কিক সাহেব আল্লাহর দ্বীনকেই বিকৃত করে ছাড়বেন। আবার কিছু বিধান আছে যেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখানো ছাড়া কখনোই সেগুলোর সুফল বোঝা যাবে না। যেমন—ইসলামি অর্থনীতি বা বিচারনীতি বাস্তবে প্রয়োগ না করে শুধু এর পক্ষে বইয়ের পর বই লিখে যাওয়াটা পূর্ণাঙ্গ সমাধান না।

তাই আল্লাহর হুকুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কী জীবনের প্রায় পুরোটা সময় ইসলামের মৌলিক জিনিসগুলোর দাওয়াহ আগে দিয়েছেন। শিরক-কুফরের মৌলিক বিষয়গুলোকে ধরে ধরে আক্রমণ করেছেন। শিরকি-কুফরি ধারণাগুলো যে কত অসার, কাফির-মুশরিকদের জীবন যে কত অন্ধকার, সেগুলো ধরে ধরে দেখিয়েছেন। ইসলামবিরোধী শক্তি এতে এমনই টালমাটাল হয়ে গেছে যে, 'ইসলামের এটা এমন কেন?' 'ওটা অমন না কেন?'-এসব প্রশ্ন তোলারই সুযোগ পায়নি; সুযোগ পেলেও হালে পানি পায়নি।

সাহাবিদের কয়েক প্রজন্ম পরই মুসলিমরা গ্রীক দর্শনের সাথে পরিচিত হয়। উম্মাহর বড় একটা অংশের তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ইসলামকে দুমড়ে-মুচড়ে দর্শনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কিছু ভ্রান্ত ফিরকার উদ্ভব হয়। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর আলিমগণ দর্শনের বিপরীতে অবিকৃত ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখেন। আর কেউ কেউ দর্শনকে এমন আক্রমণ করে এর অসারতা তুলে ধরেন যে, যাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে।

আজকে পশ্চিমা উদারনৈতিক বস্তুবাদী দর্শনগুলো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। নিজেকে সেরা মনে করে তারা ইসলামকে আক্রমণ করছে। ইসলাম কেন ওদের মনমতো হলো না—এসব জানতে চাইছে। এটা ওই মক্কা আর গ্রীসের মুশরিকদের পুরোনো কলাকৌশলের-ই নতুন রূপ। ওই একই পদ্ধতিতেই এর মোকাবিলা করতে হবে। 'সত্যকথন' সিরিজের প্রথম বইটির মতো এই বইতেও প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকার চক্রটা থেকে বের হয়ে পালটা প্রশ্ন করার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে।

শিয়া সম্প্রদায় সাহাবিদেরকে (রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) গালিগালাজ করে, কাদিয়ানিরা গোলাম আহমদ (লা'নাতুল্লাহ আলাইহি)-কে নবি মানে, কুরআনিস্টরা হাদীস অস্বীকার করে। দূর থেকে দেখে আমাদের কাছে মনে হয় তাদের যুক্তিগুলো আমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারব। কিন্তু বাস্তবে কোনো শিয়া, কাদিয়ানি বা কুরআনিস্টের সাথে তর্ক করে দেখেন, অত সহজ না। আলিম বা ইসলামের ছাত্র না হলে তাদের কিছু কুযুক্তি শুনে রীতিমতো ভড়কে যাবেন। তেমনি নাস্তিকদের সব কুযুক্তিও মজায় মজায় গল্পে গল্পে খণ্ডন করা সম্ভব না। আপনি সেসব কুযুক্তিতে কান না দিয়ে নিজের ইবাদাত-বন্দেগি নিয়ে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু নাস্তিকদের কঠিন কঠিন যুক্তিগুলো কেউ আগ্রহ ভরে শুনবে, তারপর আশা করবে শরবতের মতো সহজ করে সেগুলোর উত্তর তাকে গিলিয়ে দেয়া হোক—এটা সম্ভব না। কঠিন প্রশ্নের উত্তর কঠিন হতেই পারে। 'সত্যকথন ২'-এ কিছু কাঠখোট্টা লেখা থাকতে পারে। এরচেয়েও অনেক কঠিন কঠিন আক্রমণ নাস্তিকদের আছে। আল্লাহর কোনো-না-কোনো বান্দা সেগুলোরও সমমানের কাঠখোট্টা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। না পড়তে চাইলে নেই। কিন্তু পড়তে গিয়ে আমরা যেন 'ধুর কীসব লেখসে, কঠিন কথা বুঝি না!' বলে বই ছুঁড়ে না ফেলি।

আলিম ও তালিবুল ইলম সমাজের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে 'সত্যকথন' এর উদ্যোগের জন্য দুআ করার। বিভিন্ন সেক্টরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই তো ইসলামের খেদমত হবে। 'সত্যকথন ২' এর লেখকেরা শারয়ী সম্পাদনার জন্য আপনাদেরই মুখাপেক্ষী। আপনারা ইমামতি না করলে এরা সালাতও পড়তে পারবে না, এরা মারা গেলে জানাযাটাও আপনারাই পড়াবেন।

'সত্যকথন' পেইজ এবং এর প্রকাশিত বইয়ের উদ্দেশ্য হলো নাস্তিক-অজ্ঞেয়বাদী-সেক্যুলার কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের প্রত্যুত্তর ও ব্যবচ্ছেদ। ইসলামের দাওয়াহকে সবার কাছে পৌঁছে দেয়া। 'সত্যকথন' ফেসবুক পেইজে নিয়মিতই এ ব্যাপারে লেখা পোস্ট হচ্ছে। এই বই প্রকাশ হওয়া ('সত্যকথন ২' ১ম সংস্করণ) পর্যন্ত পেইজ থেকে প্রায় ৫০০ পর্বের লেখা পোস্ট হয়েছে। প্রতিবার পর্বের শতক পূর্ণ হলে সকল লেখার তালিকা ও লিংক এবং পিডিএফ সংকলন প্রকাশ করে পোস্ট দেওয়া হয়। পেইজের পিনপোস্টে গেলে সেটি পেয়ে যাবেন। 'সত্যকথন' শুধু বই আকারেই না, বরং সব সময়েই আপনাদের সঙ্গে আছে এবং কাজ করে যাবে ইন-শা-আল্লাহ। আপনাদের সবার অংশগ্রহণ এবং দুআ কাম্য।

আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

সত্যকথন টিম

ফেসবুক পেইজ : www.facebook.com/shottokothon1

ওয়েবসাইট : www.response-to-anti-islam.com
www.rafanofficial.wordpress.com

ক্যামেরা

তানভীর আহমেদ

ক্যানন, নিকন আর সনি এর মতো সুবিশাল কোম্পানিগুলো নিজেদের ক্যামেরার অটোফোকাস সেন্সর সবসময় উন্নত করার চেষ্টায় রত থাকে। নিরলস চেষ্টা, লক্ষ মাপামাপি, প্রোগ্রামিং আর কোটি কোটি ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মধ্য দিয়ে ক্যামেরাগুলোর অটোফোকাস সেন্সর অনেক উন্নত আর দারুণ হয়ে উঠেছে।

আগেকার কিছু ক্যামেরায় ফোকাস করতে 'Sonar' এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার হতো। একটা শব্দ যেয়ে ফিরে আসলে সেখান থেকে ফোকাস করা বস্তুটি কতদূরে রয়েছে তা ধারণা করে লেন্সের ফোকাল লেংথ বাড়িয়ে-কমিয়ে ফোকাস করা হতো। এরও আগে পেশাদার ক্যামেরাম্যানদের একজন সাহায্যকারী দরকার হতো, যে কি না দড়ি দিয়ে ক্যামেরা আর ফোকাস করা বস্তুর দূরত্ব মেপে ক্যামেরাম্যানকে জানাত! আর এরপর ক্যামেরাম্যান হিসেব কষে ফোকাস করতেন। এখনকার আধুনিক ক্যামেরাগুলো কনট্রাস্ট, শার্পনেস ইত্যাদি মাপামাপি করে নিখুঁত প্রোগ্রাম করা সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফোকাস করে থাকে।

কিন্তু এখনো সবচেয়ে অত্যাধুনিক ক্যামেরার অটোফোকাস কীভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে টিউটোরিয়াল ভিডিয়ো আসে। কোনো ক্যামেরার টাচস্ক্রিনে ফোকাস এরিয়াতে স্পর্শ করলেই হয় তো কোনো ক্যামেয়ায় ছবি তোলার আগ মুহূর্তে বাটন দিয়ে ফোকাস এরিয়া নির্ধারণ করে দেয়া লাগে। সাধারণত ছবির কোণায় থাকা বস্তু এত কসরত করে ফোকাস করা হয়।

অথচ চোখ ফোকাসিং করে আসছে শতসহস্র বছর ধরে। অন্যসব প্রাণীর চোখ বাদ দিলাম, মানুষের চোখও প্রায় ইনস্ট্যান্ট ফোকাস করে থাকে (সেকেন্ডের ৩ ভাগের ১ ভাগ সময়ে)। এই মুহূর্তে স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা মানুষটি স্ক্রিনের পেছনে তাকালে

সাথে সাথে ফোকাস হয়ে যায়। আবার ফিরে তাকালে আবারও এখানে ফোকাস। এছাড়াও ক্যামেরার লেন্সগুলো হয় ঢাউস আকৃতির আর সেখানে কাঁচ সামনে-পেছনে করে ফোকাস করতে হয়। অথচ চোখের ফোকাসিং কি না হয় লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে!

শুধু মানুষের চোখের মতো এত জটিল, এত উন্নত ফোকাসিং যে বিলিয়ন বছরের বিবর্তনেও সম্ভব না, বরং একজন Intelligent Designer বা বুদ্ধিমান নকশাকারীরই তৈরি করা সেটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এই তো গেল কেবল মানুষের চোখের কথা; ঈগলের চোখ তো মাইল দূর থেকেও ছোট জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়। একটা তুলনায় দেখা গিয়েছে, মানুষের এমন চোখ থাকলে দশ তলা সমান বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে ছোট পিঁপড়ে স্পষ্ট দেখতে পেত।

চোখের ব্যাপার নিয়ে ডারউইনও লিখতে বাধ্য হয়েছিল। On the origins of Species এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে সে লিখেছে—

> 'To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree.'

অর্থাৎ সহজভাষায়—চোখের ফোকাসিং, আলোক নিয়ন্ত্রণ এতসবকিছুর কার্যকলাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার মতো বিষয়টি, স্বীকার করতেই হয়, ন্যাচারাল সিলেকশানের নামে চালিয়ে দেয়া সবচেয়ে অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

ডারউইন সত্যের কোনো দলিল নয়। দলিল নয় কোনো থিউরি বা বক্তব্যও। ডারউইনের এই বক্তব্যটুকু অনেকেই সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ এই বিষয়ে সে অতটুকু বলেই থেমে যায়নি। বরং লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের অসম্ভবকে সম্ভব করার অবৈজ্ঞানিক ফিরিস্তি।[১]

---

[১] To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the Focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree. When it was first said that the sun stood still and the world turned round, the common sense of mankind declared the doctrine false; but the old saying of Vox populi, vox Dei, as every philosopher knows, cannot be trusted in science. Reason tells me, that if numerous gradations from a simple and imperfect eye to one complex and perfect can be shown to exist, each grade being useful to its possessor, as is certainly the case; if further, the eye ever varies and the variations be inherited, as is likewise certainly the case; and if such variations should be useful to any animal under changing conditions of life, then the difficulty of

কিছু বিবর্তনবাদী মানুষের চোখ কি 'নিখুঁত' সেই প্রশ্ন করে চলে যায় অন্যদিকে। ঈগলের চোখ বা অক্টোপাসের চোখ আরও বেশি কর্মক্ষম, নিখুঁত সেসব বর্ণনা দিয়ে তারা জাহির করে বেড়ায় যে, মানুষের চোখ মোটেও 'নিখুঁত' বা 'উন্নত' নয়। ভাষার মারপ্যাঁচ ব্যবহার করে আলোচনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা যেন তাদের রক্তে মিশে আছে।

মানুষের চোখ নিখুঁত এই দাবি কেউ করেনি। বরং চোখে আলো প্রবেশ করা, সেগুলো রেটিনায় উলটো প্রতিবিম্ব তৈরি করা, সেই প্রতিবিম্ব আবার নিউরন কর্তৃক মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়া, মস্তিষ্কে পৌঁছে উলটো প্রতিবিম্ব আবার সোজা হয়ে গিয়ে শেষমেশ দেখার অনুভূতি তৈরি করা—এত এত ব্যাপার স্যাপার, এত কারসাজি যে প্রয়োজনানুযায়ী সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এতসব প্রক্রিয়া এত সুন্দর করে হওয়ার মেকানিজমের কথা।

'মানুষের চোখ নিখুঁত না, এর থেকেও উন্নত চোখ প্রাণিকূলে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত আর নিখুঁত চোখ অক্টোপাসের চোখ; সুতরাং এসব চোখের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, এগুলো একা একাই বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন মানের হয়েছে'—এসব কথাবার্তা এই কথাগুলোর মতোই অসার—ক্যানন ৭০ডি ক্যামেরা নিখুঁত ক্যামেরা নয়, এর থেকেও উন্নত ক্যানন ৮০ডি, ১০০ডি ইত্যাদি রয়েছে। সুতরাং কোনো ক্যামেরারই কোনো তৈরিকারী, নির্মাণকারী নেই!

'মানুষ নিখুঁত সৃষ্টি না'—এই দাবির পেছনে আরেকটা বার্তা থাকে। আর সেটা হলো, অতএব মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত না। অথচ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকটি ফিচারের জন্য করা হয়নি; বরং সমস্তটা মিলে যে মানুষ, সেই মানুষকে সকল সৃষ্টির সেরা বলা হয়েছে। মানুষ তার মেধা, বুদ্ধি, দর্শন সবকিছু দিয়ে অন্যসবকিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে সে কারণে বলা হয়েছে। কিন্তু ডকিন্সরা লেকচারে আর জাফর ইকবালরা সায়েন্স ফিকশনগুলোতে যখন

---

believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, should not be considered as subversive of the theory. How a nerve comes to be sensitive to light, hardly concerns us more than how life itself originated; but I may remark that, as some of the lowest organisms, in which nerves cannot be detected, are capable of perceiving light, it does not seem impossible that certain sensitive elements in their sarcode should become aggregated and developed into nerves, endowed with this special sensibility. - On the origins of Species, Chapter 6. এখানে ডারউইন প্রথমে—চোখের এমন কুশলী প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তনে হওয়া সম্ভব না বলে মনে হয়—বলে স্বীকার করে। কিন্তু তারপর তা মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা বলে চালিয়ে দিল। বলল, এখন না কি আমরা চিন্তা করতে পারছি না। 'এমনি এমনিই হয়ে গেছে' এমন রূপকথায় আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে বলল। কীভাবে হয়েছে তা বিজ্ঞান একসময় ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু কেন হয়েছে সেটা? কেন এমনই হলো সেটার উত্তর বিজ্ঞান কখনো বলে না। 'কেন' এর উত্তর সবসময় 'এমনিতেই হয়েছে আর কী!'

বিবর্তনের সাফাই গেয়ে মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়ে(!) এখনো পুরোপুরি নিখুঁত হয়ে উঠেনি টাইপের বার্তা দিয়ে দেয়,[২] তখন শিশুমনগুলো ভেবে বসে—তবে তো বিবর্তনই সত্য; তাদের মনে প্রশ্ন উঠে—তবে কীভাবে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়? তখন যুক্তির ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দেয়ার মতো কেউ থাকে না।

বস্তুত, 'সর্বশ্রেষ্ঠ' আর 'সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' এক জিনিস নয়। আগামী দশ বছর পরের ক্যানন ৫৪৩২১ডি মডেল বের করা মানে এই নয় যে, এখনকার অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ৭০ডি মডেলের কোনো নির্মাতা নেই। এখনকার এই মডেলেই যে-পরিমাণ জ্ঞানবিজ্ঞান আর শ্রম প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই যদি এর পেছনে নির্মাতা থাকার নির্দেশ করে, তবে চোখের ওই ছোট্ট কোটরে ক্রমাগত লেন্স আকিয়ে-বাঁকিয়ে এই মুহূর্তে আপনার দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করা, প্রয়োজনে লেন্সক্যাপ (চোখের পাতা) আর লিকুইড দিয়ে চোখকে ক্রমাগত রক্ষা করার মতো কুশলী তো একজন বুদ্ধিমান নকশাকারীর দিকেই ভিড়ায়।

মুমিন অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য কিন্তু সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ে রবের কথাই যথেষ্ট হয়। আর বাকিরা সত্য পেয়েও কথা পেঁচায়, যেমনটা ডারউইন করেছিল, করছে এখনকার ডারউইনবাদীরা।

> 'শীঘ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, এটা সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?'[৩]

---

[২] অক্টোপাসের চোখ, ডক্টর জাফর ইকবাল। এই সায়েন্স ফিকশনটিতে—মানুষের বিভিন্ন দিক নিখুঁত না, আর এটা বিবর্তনের ধারাতে আরও নিখুঁত হতে পারত—এমন একটা বার্তা দেয়া হয়েছে। যদিও শেষমেশ মানুষের নিজের ডিজাইন করা ত্রুটিবিহীন মানুষে সভ্যতার পরাজয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু বিবর্তনবাদ সত্য ধরে নিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনে যা অর্জিত হয়েছে সেটাই ভালো এমন বার্তা থেকেই গেছে। কখনো বার্তা এমন হয়নি যে, সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্তই ভালো।

[৩] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫৩।

নাস্তিকদের সব অভিযোগের জবাব দিন মাত্র দুই বাক্যে!

আসিফ মাহমুদ

শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিকদের সব অভিযোগের জবাব মাত্র দুটি বাক্যেই দেয়া সম্ভব। তবে এজন্য মোরাল ফিলোসফি বা নৈতিক দর্শন সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা দিতে হবে।

কয়েক যুগ থেকেই ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কখনো রাসূল ﷺ-এর যুদ্ধ নিয়ে, কখনো তাঁর বিয়ে নিয়ে, কখনো-বা দাসপ্রথা নিয়ে। প্রায় সব প্রশ্নের ধরণই এক। তিনি কেন বানু কুরাইযার সব পুরুষকে হত্যা করেছিলেন? এটা খুব নির্মম! কেন তিনি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে মাত্র ৬ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন? তিনি নারীলোভী! কেন ইসলাম দাসপ্রথা সমর্থন করে? এটা বর্বর!

পাঠক, একটা বিষয় লক্ষ্য করলে দেখবেন, তারা শুধু প্রশ্ন করছে না, সাথে একটা সিদ্ধান্তও জুড়ে দিচ্ছে। সিদ্ধান্তগুলোর সারকথা হচ্ছে, ইসলাম যেই কাজগুলো করেছে বা রাসূল ﷺ যেই কাজগুলো করেছেন সেগুলো 'অনৈতিক'। এখানেই আমাদের আলোচনা শুরু হয়।

নৈতিকতা এবং অনৈতিকতা নিয়ে দর্শনের যেই পাঠ তাকে বলা হয় 'মোরাল ফিলোসফি' বা 'নৈতিক দর্শন'। নৈতিকতা মূলত তিন ধরনের। অবজেক্টিভ, রিলেটিভ এবং ইমোটিভ। মূল আলোচনা হয় অবজেক্টিভ মোরালিটি আর রিলেটিভ মোরালিটির একটা চরম রূপ—যেটা সাবজেক্টিভ মোরালিটি নামে পরিচিত—এই দুটো নিয়ে। এই দুটোর আমি সংজ্ঞায়ন করছি, একটু বোঝার চেষ্টা করুন।

অবজেক্টিভ মোরালিটি বা অবজেক্টিভ নৈতিকতা হচ্ছে কিছু সর্বজনীন নৈতিক নিয়ম

যেগুলো ব্যক্তি, সমাজ, কালভেদে পরিবর্তন হয় না। এই পৃথিবীতে নৈতিকতা, অনৈতিকতার কিছু স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে। যেমন—মিথ্যা বলা অনৈতিক, হত্যা করা অনৈতিক। এমন না যে জনাব করিমের জন্য মিথ্যা বলা অনৈতিক কিন্তু জনাব সলিমের জন্য নৈতিক। বরং, এটা সর্বজনীন। এই অবজেক্টিভ মোরালিটির দাবিদার হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষজন, যেমন—আমরা মুসলিমরা। আমরা দাবি করি, সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে আমরা ওহির মাধ্যমে নৈতিকতার কিছু স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড পেয়েছি। কোন কাজটা নৈতিক, কোন কাজটা অনৈতিক তার একটা সুস্পষ্ট নীতিমালা পেয়েছি। আর এগুলো ব্যক্তিভেদে পরিবর্তন হয় না, সমাজভেদে, সময়ভেদে পরিবর্তন হয় না। এগুলো সর্বদা ধ্রুব। এটাই অবজেক্টিভ নৈতিকতা।

অনেকেই অবজেক্টিভ মোরালিটির সাথে এবসলিউট মোরালিটি বা পরম মোরালিটি গুলিয়ে ফেলেন। যেমন—হত্যা করা অনৈতিক। এখন কেউ বলতেই পারেন যে, আত্মরক্ষার্থে হত্যা করা কি অনৈতিক? কিংবা অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ? উত্তর হচ্ছে, না, অনৈতিক না। তাহলে কি অবজেক্টিভ মোরালিটির সংজ্ঞা লঙ্ঘন হচ্ছে? একদমই না। অবজেক্টিভ মোরালিটি হচ্ছে কিছু নীতিমালার সমষ্টি। এখানে নৈতিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শর্ত নির্ধারণ করা থাকে। যেমন—জানের ওপর আঘাত আসলে মিথ্যা বলাও নৈতিক, আত্মরক্ষার্থে হত্যা করা নৈতিক, এগুলো নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। আর এই নিয়মগুলো সদা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যদি এমন বলা হতো, কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা বৈধ না, হত্যা করা বৈধ না, তাহলে সেটাকে বলা হতো এবসলিউট মোরালিটি। দুইটায় তফাৎ আছে, বোঝা গেছে?

এবার আসি, সাবজেক্টিভ মোরালিটি বা সাবজেক্টিভ নৈতিকতা কী? সাবজেক্টিভ মোরালিটি হচ্ছে, নৈতিকতা ধ্রুব না। এটা ব্যক্তিভেদে, সমাজভেদে, সময়ভেদে ভিন্ন হতে পারে। তাই তারা নৈতিকতার একটা মানদণ্ড আছে এই বিষয়টা অস্বীকার করে। যেখানে অবজেক্টিভবাদীরা দাবি করে ২+২=৪ যেমন সত্য, তেমনই নৈতিকতারও কিছু ধ্রুব সত্য আছে। যেমন : মিথ্যা বলা অনৈতিক, চুরি করা অনৈতিক ইত্যাদি। এগুলো ব্যক্তিভেদে পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সাবজেক্টিভবাদীরা বলে—না, এটা ধ্রুব না; একেক ব্যক্তির জন্য একেকরকম। একেকজনের নৈতিক অবস্থান একেকরকম হতে পারে। যেমন—কোনো কোনো ব্যক্তির কাছে সমকামিতা নৈতিক হতে পারে, কোনো কোনো ব্যক্তির কাছে অনৈতিক হতে পারে। স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড বলে কোনোকিছু নেই, যার যার পছন্দ।

আশা করি পার্থক্যটা কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। এই হলো প্রাথমিক পাঠ। এখন আবার আগের বিষয়ে ফিরে যাই। একজন নাস্তিক যখন রাসূল ﷺ-এর কোনো

একটা কাজকে অনৈতিক বলছে বা ইসলামের কোনো একটা অবস্থানকে অনৈতিক বলছে, তাকে প্রথম যেই প্রশ্নটি করবেন তা হলো—

'তুমি কি অবজেক্টিভ মোরালিটিতে বিশ্বাস করো, না কি সাবজেক্টিভ?'

উত্তরে যদি সে বলে—'সাবজেক্টিভ মোরালিটিতে বিশ্বাস করি', তবে কি তার আর সমালোচনা করার সুযোগ আছে পাঠক? কারণ সে তো মনে করে নৈতিকতা ধ্রুব না, একেক ব্যক্তির, একেক সমাজের নৈতিক অবস্থান একেকরকম হতে পারে, কোনো মানদণ্ড নেই, তাহলে সে কীভাবে রাসূল ﷺ-এর কোনো একটা কাজকে 'নৈতিক' বা 'অনৈতিক' মোড়ক লাগাতে পারে?

কিন্তু...

উত্তরে সে যদি বলে—'আমি অবজেক্টিভ মোরালিটিতে বিশ্বাস করি', তাহলে তাকে যেটি বলবেন তা হলো—'তোমার অবজেক্টিভ মোরাল মূল্যবোধগুলোর মানদণ্ড কী? তোমার নৈতিকতার যেই মানদণ্ড, সেটি যে সত্য তার প্রমাণ দাও! যখন তুমি তোমার নৈতিকতা সত্য বলে প্রমাণ করবে, তারপর তুমি ইসলামকে সমালচনা করবে, এর আগে নয়।'

এই জায়গায় পাঠকের হয়তো বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। বুঝিয়ে বলছি।

ধরুন, আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন। সেখানে কিছু প্রশ্ন ছিল, সেগুলোর উত্তর লিখেছেন। এখন, আপনার উত্তরগুলো ঠিক না কি ভুল, এটা কে যাচাই করতে পারবে? যে সঠিক উত্তরগুলো জানে, সে যাচাই করতে পারবে। এখন ধরুন, একজন এসে বলল আপনার উত্তরগুলো ভুল। আপনি কেন তাকে মেনে নেবেন? আগে তো তাকে প্রমাণ দিতে হবে যে, সে যেই উত্তরগুলো জানে সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই সঠিক এবং সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে সে আপনার উত্তরকে ভুল বলছে। আমি সেই প্রমাণের কথাই বলছি।

এখন বলতে পারেন, নাস্তিকরাও তো আমাদের কাছে প্রমাণ চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে বলি, অবজেক্টিভবাদীরা বিশ্বাস করে 'মোরাল ট্রুথ' বা 'নৈতিক সত্য' বলে কিছু একটা আছে এবং সেটা ধ্রুব ও সর্বজনীন। চুরি করা একই সাথে নৈতিক এবং অনৈতিক হতে পারে না। অবশ্যই যেকোনো একটি হবে। এখন 'চুরি করা অনৈতিক' এই কথাটি যে সত্য তা আমরা কীভাবে জানব? উত্তর সহজ! আমরা এটা জানব একজন বাইরের কর্তৃপক্ষের থেকে, যিনি হচ্ছেন স্রষ্টা। তিনি জানেন তাঁর সৃষ্টির জন্য কোনটা 'নৈতিক' আর কোনটা 'অনৈতিক'। আর একমাত্র তিনিই সেই মানদণ্ড ঠিক করে দিতে পারেন। তাই, আমাদের নৈতিকতা সত্য।

আমাদের নৈতিকতা সত্য কি না এই প্রশ্ন তোলার বদলে আমাদের স্রষ্টা এবং ধর্মগ্রন্থ সত্য কি না সেটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে বড়জোর। সেটা একটা বিশদ আলোচনার বিষয়। অবশ্যই আমরা প্রমাণ দিতে পারি। অনেক আলোচনা, বই আছে এসবের ওপর।

কিন্তু..

একজন নাস্তিক তার নৈতিকতা সত্য এটা কীভাবে প্রমাণ করবে? তার তো স্রষ্টা নেই। ফলে তাকে নৈতিকতার কোনো একটা মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে যেটা মনুষ্য সৃষ্ট। মনুষ্য সৃষ্ট মানদণ্ড ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট হবে এটা বলাই বাহুল্য। তাও আপনারা শুনবেন, তার মানদণ্ড কী এবং তাকে বলবেন, সে যেন তার মানদণ্ড প্রমাণ করে। সেটা যে সত্য তা যেন সে প্রমাণ করে দেখায়। এবার সেটা যাই হোক!

বাস্তবতা হলো তারা পারবে না। আর যদি না পারে, তবে মানবো কেন? তবে কেন তার কথায় আমরা রক্ষণাত্মক হব? এটা তো সেই পরীক্ষার খাতা দেখার মতোই ব্যাপার হলো। সে প্রশ্নগুলোর যেই উত্তর জানে সেগুলো যে সত্য এবং সঠিক তা যদি প্রমাণ করতেই না পারে, তাহলে আমি তার কথায় আমার উত্তরগুলোকে ভুল কেন মনে করব বা সংশয়ে ভুগব? বোঝা গেছে?

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে দিই। অধিকাংশ নাস্তিক নৈতিকতার মানদণ্ড জানতে চাইলে ইউটিলিটারিয়ানিজমের (উপযোগবাদ) কথা বলে, অপকার প্রিন্সিপালের (অপকার নীতি) কথা বলে। তাদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন, ইউটিলিটারিয়ানিজম যে সত্য, তা প্রমাণ করো। অপকার প্রিন্সিপাল সত্য তা প্রমাণ করো। যদি প্রমাণ করতে না পারো, তাহলে চুপ থাকো। তোমার প্রশ্নের, অভিযোগের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ নাস্তিক (বিশেষত নব্য নাস্তিক) লিবারেল (উদারনীতিবাদের) দর্শনকে আপন করেছে। তারা 'মানবাধিকার' এর ঝান্ডাধারী হয়েছে। এই মানবাধিকারের জন্ম হয়েছে ইউরোপীয় আলোকায়নের গর্ভে জন্ম নেয়া সেকুলারিজম ও লিবারেলিজমের নৈতিকতার বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে। সেকুলারিজম আর লিবারেলিজম মানুষের সৃষ্ট কিছু তত্ত্ব মাত্র। এগুলোর বুনিয়াদ কি সত্য? 'সব মানুষ সমান', 'অন্যের ক্ষতি না করে যা কিছু ইচ্ছে করা যাবে', ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, সমানাধিকার—এই ধারণাগুলোর ভিত্তি কী? কারা ঠিক করে দেয় এগুলো? এগুলো কি সত্য? প্রমাণ কী? আর যদি সত্য না হয়, তবে কি এগুলো পৃথিবীর কল্যাণের জন্য কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাত্র? যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষাই হয়, সেটা সারাবিশ্বে চাপানো হবে কেন? যুদ্ধের মাধ্যমে, হস্তক্ষেপের মাধ্যমে,

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে, অবরোধের মাধ্যমে সারাবিশ্বে এই নৈতিকতা চাপিয়ে দেয়া হবে কেন? আর চাপিয়ে দিতে চাইলেই আমরা মানবো কেন?

প্রিয় মুসলিম ভাইবোনেরা, এই প্রশ্নগুলো করতে শিখতে হবে। রক্ষণাত্মক হবেন না। অল্পেই ভয় পাবেন না। ইসলাম এত ঠুনকো নয় যে, নাস্তিক বা লিবারেলদের কয়েকটা যুক্তিতেই মিথ্যা হয়ে যাবে। ইসলাম সত্য। আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য, রাসূল ﷺ-এর শেষ-নবি হওয়া সত্য, কুরআনের ওহি হওয়া সত্য, আখিরাত সত্য, মালাইকাগণ সত্য, নবি-রাসূলগণ সত্য, তাকদীর সত্য। ভয় পাবেন না, সংশয়ে ভুগবেন না। পড়ুন! সত্য আবিষ্কার করবেন প্রতিনিয়ত ইন-শা-আল্লাহ।

কেন ও কীভাবে

মুহাম্মাদ মশিউর রহমান

'WHY' & 'HOW'...

'কেন' ও 'কীভাবে'...

বড়ই অদ্ভুত দুটি প্রশ্ন।

একটার উত্তর হলো 'কারণ', অন্যটার হলো 'প্রসেস' বা 'প্রক্রিয়া'।

আধুনিক যুগের নব্য মডারেট মুসলিমরা, বা আর্টস-কমার্স-সাহিত্য প্রভৃতি ব্যাকগ্রাউন্ডের 'তুখোড় বিজ্ঞানীরা' যখন শুধুমাত্র বিজ্ঞানের আলোকে সবকিছুকে আলোকিত করে ফেলে ব্যাখ্যা করতে যায়; তখন তারা ভুলে যায় যে, বিজ্ঞান জিনিসটা দাঁড়িয়েই আছে মূলত পর্যবেক্ষণের ওপর, এবং তা হলো প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্বজগতের কেবলমাত্র অতীব ক্ষুদ্র অংশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত—যেখানে কিছু বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এই বিশ্বজগত হলো অসীম, আবার কেউ কেউ বলেন তা এখন পর্যন্ত যা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার আরও ২০ গুণ বেশি,[৪] আর কিছু বিজ্ঞানীরা তো বেরসিকের মতো বলে বসেন যে, তা কমপক্ষে ২৫০ গুণ বেশি বড়।[৫]

কাজেই পর্যবেক্ষণ নেই, তো এই 'বিশেষ জ্ঞান'-এর কোমরে জোরও খুঁজতে গেলে

---

[4] https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/universe-galaxies-how-big-many-size-observable-map-history-nottingham-a7360736.html
https://www.theguardian.com/science/2016/oct/13/hubble-telescope-universe-galaxies-astronomy

[5] https://www.technologyreview.com/2011/02/01/197279/cosmos-at-least-250x-bigger-than-visible-universe-say-cosmologists/

দেখা যাবে নেই।

এর ফলে দেখা যায় যে, বাঘ-পেঁচা প্রভৃতির মুখোশ নিয়ে মঙ্গল কামনা করতে বের হওয়া এই প্রবল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রদায়—কোনো একটা ঘটনা কী কারণে ঘটে, বিপুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে—'কেন' ও 'কীভাবে'-এর মধ্যে লেজে-গোবরে পাকিয়ে একেবারে বীভৎস এক পরিস্থিতির জন্ম দেয়, যা তারা নিজেরাও জানে না, বা জানলেও হয়তো আস্তে করে চেপে যায়। আল্লাহ ভালো জানেন।

যেমন ধরুন, উদাহরণস্বরূপ বলা হলো, বৃষ্টি কেন হয়?

এদের ব্যাপারে একটা কথা বলাই বাহুল্য যে—এরা কিছু জানুক আর না-ই জানুক, পাণ্ডিত্য জাহির করার ক্ষেত্রে সবার আগে গলা বাড়িয়ে ছুটে আসে এরাই, তা কেউ এদের কাছে জবাব চাক বা না-চাক।

বৃষ্টি কেন হয়—জবাবে দেখা যাবে কথার তুবড়ি ছুটে গেছে। এর মধ্যে দুয়েকটা কথার মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হলে বোঝা যাবে যে, তারা বলার চেষ্টা করছে—'সূর্যের তাপে পানি ওপরে উঠে, উঠে নিম্নতাপমাত্রায় জমে, তারপর ওজনের ভারে নিচে নেমে আসে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বাতাস যত উত্তপ্ত হয় ততই হালকা হয়ে ওপরে উঠতে থাকে। অর্থাৎ বায়ুমন্ডলের ওপরের দিকে থাকে হালকা উত্তপ্ত বাতাস, নিচে ভারী তুলনামূলক শীতল বাতাস। তাহলে উত্তপ্ত বাতাস ঠান্ডা হয় কীভাবে, বা এসবের মধ্যে শিশিরাঙ্ক নামক বস্তুর কাজই বা কী—এসব কিছু এদেরকে জিজ্ঞেস না করাই উত্তম হবে; আল্লাহু আলাম। কারণ, এদেরকে বৃষ্টি হবার কারণ জিজ্ঞেস করে আপনি অলরেডি উত্তরে পেয়েছেন বৃষ্টি হবার প্রসেস বা প্রক্রিয়া, যতটুকুই হোক-না-কেন।

আবার ধরুন, ভূমিকম্প।

সবার আগে দৌঁড়ে এসে জ্ঞানের পসরা খুলে বসে বলবে—'টেকটোনিক প্লেটে প্লেটে সংঘর্ষের কারণে মাটি কেঁপে উঠেছে, এখানে অন্য কিছু মনে করার অবকাশ নেই; ওসব মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা।'

ফলাফল একই, ঘুরেফিরে আবারও সেই 'ফির পেহলে ছে।'

মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে, আপনার কোনো এক বন্ধুকে হঠাৎ কক্সবাজারে ঘুরতে দেখে আপনি জিজ্ঞেস করলেন—'এখানে কেন', আর সে ব্যক্তি উত্তর দিলেন—'কক্সবাজারে আসার বাসে চড়েছি, বাস এখানে এসে নামিয়ে দিয়েছে,

তাই এখানে।'

কিন্তু না, এক্ষেত্রে যেকোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই থামিয়ে দিয়ে বলবেন—'না না, কক্সবাজারে যাবার এটা তো কোনো কারণ হতে পারে না; এটাতো সে ব্যক্তি কীভাবে এখানে এসেছে তা বলা হলো। কারণ তো হবে হয়তো বেড়ানো, বা আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করা বা অন্য কিছু।'

আসল ব্যাপারটা ঠিক এই জায়গায়।

বৃষ্টি বা ভূমিকম্প, এদেরকে আপনি একটু গলার জোর বাড়িয়ে বলুন যে, প্রক্রিয়া না, কারণ বলতে—বিজ্ঞানমনস্করা দেখবেন শোলমাছের মতো পিছলে যাবার ধান্দায় আছে।

বিশ্বজগত সৃষ্টির কারণ জিজ্ঞেসে বিগ ব্যাং-এর মুখস্ত বুলি কপচানো শুরু করলে হালকা করে একটা ঝাড়ি দিয়ে বলুন যে, কীভাবে না, কেন সৃষ্টি হয়েছে তা বলতে; দেখবেন বিজ্ঞানীরা নিশ্চুপ।

এদেরকে 'কেন জন্মেছে' জিজ্ঞেস করলেও দেখা যাবে শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর নিষেকের কাহিনি শুরু করেছে, 'কেন মারা যাবে' জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে ব্রেইনডেড হবার বুলি আওড়াচ্ছে।

আসলে এরা সবসময়ই বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে। এদের জীবনটা চলেও বিভ্রান্তিতে, শেষও হয় বিভ্রান্তিতে।

এরাই শয়তানের অন্যতম হাতিয়ার—তার নিজের দল ভারী করার জন্য, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে করে আসা তার অভিশপ্ত ওয়াদা পূরণের জন্য।

কাজেই চিন্তা করুন, মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হোন।

জানুন যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টি কোনো দুর্ঘটনা নয়, বা মালিকুল মূলকের কোনো ক্রীড়াকৌতুক নয়।[৬]

জানুন যে, আপনার জন্ম বা মৃত্যু আপনার জন্য পরীক্ষা, কখনোই কারণহীন বা উদ্দেশ্যহীন নয়।[৭]

---

[৬] 'আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' [সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১৬।]

[৭] 'পূণ্যময় তিনি যাঁর হাতে রাজত্ব, এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী।'
⇨ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ; এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, ক্ষমাময়।' [সূরা মূলক, ৬৭ : ১-২।]

চিন্তা করুন...[৮]

[৮] '...এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো।' [সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৯]

⇨ '...এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করো।' [সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬৬]

⇨ '...আপনি বলে দিন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করো না?' [সূরা আনআম, ৬ : ৫০।]

⇨ '...আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন; তোমরা কি চিন্তা করো না?' [সূরা আনআম, ৬ : ৮০।]

⇨ '...নিশ্চয়ই আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা চিন্তা করে।' [সূরা আনআম, ৬ : ৯৮।]

⇨ '...ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব; কাজেই কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। তোমরা কি কিছুই চিন্তা করো না?' [সূরা ইউনুস, ১০ : ৩।]

⇨ 'তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন, এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত ও নদনদী এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দুটি করে প্রকার সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে।'

⇨ 'এবং জমিনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে—একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙুরের বাগান আছে আর শস্য ও খর্জুর রয়েছে—একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বার সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দিই। নিশ্চয়ই, এগুলোর মধ্যে নিদর্শন আছে তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।' [সূরা রা'দ, ১৩ : ৩-৪।]

⇨ '...আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।' [সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৫।]

⇨ 'এটা (কুরআন) মানুষের জন্য একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই– একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানেরা চিন্তাভাবনা করে।' [সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৫২।]

⇨ 'তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব রং-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।' [সূরা নাহল, ১৬ : ১৩।]

⇨ 'যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি তবে চিন্তা করবে না?' [সূরা নাহল, ১৬ : ১৭।]

⇨ 'আমি এই কুরআনকে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখীতাই বৃদ্ধি পায়।' [সূরা ইসরা, ১৭ : ৪১।]

⇨ 'তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না...?' [সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৬৮।]

⇨ '...বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।' [সূরা যুমার, ৩৯ : ৯।]

⇨ 'তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন রুজি। চিন্তাভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে ঋজু থাকে।' [সূরা গাফির, ৪০ : ১৩।]

⇨ 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪।]

⇨ 'যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।' [সূরা হাশর, ৫৯ : ২১।]

ইসলামোফোবিয়া

ডা. রাফান আহমেদ

বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও মিথ্যা ছড়ানো একটি বিশাল বানিজ্য। বাংলাদেশের অনলাইনে তৎপর নাস্তিকদের কথোপকথনের সময় বেরিয়ে এসেছে—তারা ইসলামের বিরুদ্ধে লেখালেখি ও এক্টিভিজমের দ্বারা অর্থ পায়।

একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে মিডিয়া জুড়ে কোন ধর্মের আলোচনা-সমালোচনা-নিন্দা সবচেয়ে বেশি চলে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজেই আঁচ করা যায়—সে ধর্ম হলো ইসলাম! এথনিক/কালচারাল/ফোক মুসলিমরা (যদিও এমন কোনো পরিভাষা মূল ইসলামে নেই) ইসলামের কথা শুনলেই কেমন এক হীনমন্যতায় ভোগেন! সন্ত্রাসবাদী ও বর্ণবাদী পশ্চিমাদের মিডিয়া আগ্রাসনে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলাম নিয়ে অমুসলিম তো বটেই, নামে মুসলিমদের মাঝেও বিরক্তি, আশংকা, ভয় কাজ করতে দেখা যায়।

এর কারণ কী হতে পারে? এর কারণ কি সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনাবলী, যা আমরা ঘটতে দেখছি? না কি এর কারণ হতাহতের সংখ্যা? তাই যদি হয়, তবে যুক্তির আলোকে অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদকে আমাদের ততটুকু 'ভয়' বা 'ঘৃণা' করা উচিত হবে কি? যদি আরও বেশি ভীত আমরা হতে না চাই! মুসলিম হিসেবে তা আমরা কখনোই সমর্থন করি না; বরং আমরা আশা ও ভালোবাসার বাণী শোনাতে চাই। কিন্তু কেন এই নেতিবাচক মনোভাব শুধুমাত্র ইসলামের প্রতি? একই কাজ অন্য মতবাদ বা ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রে কেন এত প্রচার পায় না? কেন আমাদের ভেতর বিরক্তি ও ভয় উদ্রেক করে না?

এটা কি প্রায় ৪৩ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নের ফল, যা সরাসরি ইসলামের প্রতি

ঘৃণা ও ভয় ছড়াতে অনুদান দেয়া হয়েছিল! অবাক হলেন না কি? বানিয়ে বলছি না কিন্তু। Center for American Progress এর গবেষণা অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০০৯ সালের মাঝে সাতটি গোষ্ঠি প্রায় ৪২.৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান প্রদান করেছে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামভীতি ছড়াতে নিয়োজিত দলগুলোকে![৯] তাদের প্রচারিত মিথ্যা তথ্য এরপর ছড়িয়ে পড়ে আরও বড় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যাতে অংশ নেয় অ্যাকটিভিস্ট, মিডিয়া, রাজনীতিবিদ এবং আরও অনেকে, যা ইসলাম একটি সহিংস ধর্ম এই ভুল ধারণার প্রতিধ্বনি ঘটায়। সাম্প্রতিক সময়ে এই অনুদানের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে আশংকাজনক হারে!

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ভিত্তিক সর্ববৃহৎ মুসলিম নাগরিক অধিকার এবং অ্যাডভোকেসি সংস্থা কাউনসিল অন অ্যামেরিকান -ইসলামিক রিলেশনস (CAIR) কর্তৃক ২০১৩ সালে প্রকাশিত 'Legislating Fear : Islamophobia and its Impact in the United States' প্রতিবেদনে জানা যায়, ইসলামবিরোধী গোষ্ঠীগুলো ২০০৮-২০১১ সালের মাঝে অনুদান পেয়েছে ১১৯ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ![১০] ২০১৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Berkeley Center for Race & Gender এবং CAIR যৌথভাবে গবেষণার ফল প্রকাশ করে 'Confronting Fear: Islamphobia and its Impact in the United States' প্রতিবেদনে এবং জানায় যে, ২০০৮-২০১৩ সালের মাঝে ইসলামোফোবিয়া ছড়াতে নিয়োজিত দলগুলো অনুদান পেয়েছে ২০৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ![১১]

আচ্ছা, যদি এই পরিমাণ অর্থ অন্য কোনো মতবাদ (যেমন : গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র) বা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন ছড়াতে ব্যবহৃত হয় তবে কী পরিণতি হবে?

সেক্যুলার পশ্চিমা গবেষকদের গবেষণায় জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের অন্তঃকেন্দ্রে রয়েছে প্রায় ৩৩টি গোষ্ঠী, যাদের মূল লক্ষ্য হলো ইসলাম

---

[৯] https://www.americanprogress.org/issues/religion/report/2011/08/26/10165/fear-inc/

[১০] http://www.cair.com/press-center/press-releases/12149-cair-report-islamophobia-network-funded-with-119-million-2008-to-2011.html;
http://www.nydailynews.com/news/national/anti-muslim-groups-rake-millions-u-s-article-1.1461566

[১১] Confronting Fear: Islamphobia and its Impact in the United States, p. vii
http://crg.berkeley.edu/content/confronting-fear
https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/20/islamophobia-funding-cair-berkeley-report
http://www.nbcnews.com/news/asian-america/mosque-attacks-apparent-anti-islam-spending-report-n595826
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/report-islamophobia-multi-million-dollar-industry-160623144006495.html

ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো। এছাড়া আরও ৪১টি দল ইসলামোফোবিয়ার সমর্থনে কাজ করে যাচ্ছে যাদের দ্বারা নেটওয়ার্কের বহিঃকেন্দ্র গঠিত।[১২] ইসলামবিরোধী আইন প্রণয়নের ধারাবাহিকতায়, ২০১৫ সালে ৩১টি বিল বা সংশোধনী প্রণয়ন করা হয়েছে ১৭টি অঙ্গরাজ্যের আইন সভায়, যার মূল লক্ষ্য মুসলিমদের ধর্মীয় আচারসমূহের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা। এর মধ্যে ২৩টি বিল সেই ভাষা বহন করে যা ডেভিড ইয়েরুশ্যালমাই এর 'অ্যামেরিকান ল'স ফর অ্যামেরিকান কোর্টস (ALAC)' থেকে গৃহীত। কেন এই বিষয়টি জানা জরুরি? কারণ, ডেভিড অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ভীতি ছড়াতে সিদ্ধহস্ত। এরপরও আইন নেয়া হচ্ছে তার থেকে? এই বিলগুলোর মাঝে ৩০টি বিল প্রণয়নে অর্থায়ন করেছে শুধুমাত্র রিপাবলিকান নেতারা। বাকি একটি বিল প্রণয়নে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক উভয়পক্ষ অংশ নিয়েছে!

মূল ইসলামকে পরিবর্তন করে কীভাবে 'মডারেট ইসলাম'কে প্রচলিত করা যায়, সে উদ্দেশ্যে একের-পর-এক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে! [১৩] কিন্তু কেন তারা এই নীচু কৌশল অবলম্বন করছে? কারণটা সহজ, তারা দুর্বলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা তারা হীনমন্যতায় আক্রান্ত। কারণ তারা এমন বিক্রেতা যার পণ্য নিম্নমানের। তাই আপনাদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রির জন্য তাদের মনোনিবেশ করতে হয় অন্যের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত মিথ্যা ছড়াতে।[১৪] অধিকাংশ সময় তাদের এই চেতনার প্রকাশ ঘটে, কারণ তারা জানে যা তাদের নিকট আছে তা কোনোক্রমেই উত্তম নয়। তাছাড়া এই নেতিবাচক মানুষগুলো আত্মিকভাবেও ব্যর্থ।

তাহলে আমরা কেন ভীত?

কারণ কিছু মানুষের অন্তর ঘৃণায় পরিপূর্ণ, আর তারা এই ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে যাতে করে আমরাও 'ঘৃণা' ও 'ভয়ের' মহামারিতে আক্রান্ত হই। বিশ্বায়নের যুগে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সারাবিশ্বে দাবানলের মতো।[১৫] ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মাসজিদগুলোর ওপর ৭৮ বার হামলা করা হয়েছে, যা আগের বছরগুলোর তুলনায় ৩ গুণ! [১৬] যুক্তরাজ্যে মুসলিমবিদ্বেষী আক্রমণের হার ২০১৫ সালে বেড়ে

---

[১২] Confronting Fear: Islamphobia and its Impact in the United States, p. vii

[১৩] মডারেট ইসলাম (Moderate Islam) বাস্তবায়নে RAND Corporation এর পরিকল্পনাপত্র Civil Democratic Islam, Building Moderate Muslims Network ইত্যাদি।

[১৪] http://money.cnn.com/2015/01/18/media/fox-apologizes-for-anti-islam-comments

[১৫] http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx

[১৬] Confronting Fear: Islamphobia and its Impact in the United States, p. viii

দাঁড়িয়েছে ৩২৬%, যার লক্ষ্যবস্তুর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী, প্রায় ৬১%![১৭]

এর মানে কি মুসলিমরাও ঘৃণা ছড়াবে? না। বরং তাদের আরও বেশি উদ্যমী হতে হবে সত্য প্রকাশে এবং ইসলামের সৌন্দর্যকে যৌক্তিকভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে। আশার কথা হলো, এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসংখ্য অমুসলিম ইসলামকে অধ্যয়ন করে নিজের জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করছে![১৮] অবাক হচ্ছেন?

অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও মনন হয়েছে। যখন আমাদের চিন্তা ও চেতনায় গণমাধ্যমের অনধিকার প্রবেশ আমরা বন্ধ করতে পারব, কেবল তখনই মুক্তি সম্ভব। তা না হলে আমরা মিডিয়ার দাসে পরিণত হব। ম্যালকম এক্স[১৯] বলেছিলেন,

> 'The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.'

'মিডিয়া হলো পৃথিবীর বুকে অত্যন্ত ক্ষমতাধর সত্ত্বা। তাদের ক্ষমতা আছে নির্দোষকে অপরাধী ও অপরাধীকে নির্দোষে পরিণত করার, এবং এটা সত্যিই এক শক্তি। কারণ, তারা জনসাধারণের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে।'[২০]

তাই আসুন নিজের অন্তরকে সত্যের পানে উন্মুক্ত করি, সত্য জানতে সচেষ্ট হই। কারণ, সত্য মুক্তির পথ দেখায়।[২১]

---

[১৭] http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-muslim-racism-hate-crime-islamophobia-eu-referendum-leave-latest-a7106326.html

[১৮] https://m.youtube.com/watch?v=_DeBzL9TJBs;
https://m.youtube.com/watch?v=vSGNybMDTgI

[১৯] Malcolm X (১৯২৫-১৯৬৫) ছিলেন একজন আফ্রিকান-মার্কিন মুসলিম রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতা, যিনি যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের মানবাধিকার আদায়ের আন্দোলনে অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিলেন। জন্মের পর তাঁর নাম দেয়া হয় Malcolm Little। পরবর্তীতে Nation of Islam এর নেতা ও নুবুওয়াতের দাবিদার এলিজা মুহাম্মাদের আদর্শ (Elijah Muhammad) দ্বারা প্রভাবিত হন ও তার মত গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নাম হয় ম্যালকম এক্স। ঘটনাচক্রে তিনি Elijah Muhammad এর গোপন চারিত্রিক কলুষণের সংবাদ পান ও গভীরভাবে আহত হন, কারণ তিনি তাকে নবি মনে করতেন। পরবর্তীতে তিনি মক্কায় হাজ্জে গমন করেন। সেখানে বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বরূপ দেখে তিনি উজ্জীবিত হন ও মূলধারার ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আল-হাজ্জ মালিক আল-শাব্বাজ নামেও পরিচিত। দেখুন: http://malcolmx.com/biography

[২০] https://www.goodreads.com/quotes/74430-the-media-s-the-most-powerful-entity-on-earth-they-have

[২১] লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় callingtotheone ব্লগে। সেখান থেকে ঈষৎ পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

প্রমাণ দাও

আসিফ মাহমুদ

এক ভারতীয় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান অভিষেক উপমন্যু তার এক ভিডিয়োতে কৌতুকের ছলে কিছু কথা বলেছিলেন। তিনি তার বাবাকে বলছিলেন, 'বাবা, বড়দের কেন সম্মান করতে হয়?' বাবা অনেকক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'উম.. এমনিই করতে হয়।' ছেলে আবার বলল, 'এমনি কেন? কোনো কারণ তো থাকা চাই!' তখন বাবা বললেন, 'কারণ, আমরা আগে জন্মেছি..!' ছেলে বলল, 'তো? আর?' এরপর বাবা বললেন, 'আর তো কিছু জানি না!' ছেলে বলল, 'যদি না করি?' তখন বাবা আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বললেন, 'তাহলে দাঁতে পোকা ধরবে...!'

এই ঘটনাটি কেন আনলাম একটু পরেই বুঝিয়ে বলছি। তার আগে একটা ব্যাপার ভেবে দেখুন। আমরা নিত্যদিনে চলার পথে কী কী কাজকে বৈধ মনে করি, কী কী কাজকে অবৈধ মনে করি? আমরা সত্য কথা বলাকে বৈধ, মিথ্যা বলাকে অবৈধ মনে করি। চুরি করাকে খারাপ মনে করি। কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করাকে খারাপ মনে করি। এই যে কিছু বৈধ-অবৈধ ধারণা বা ভালো-খারাপ ধারণা, এগুলো কোথা থেকে এল? কারা ঠিক করে দিল? এই নৈতিক অবস্থানগুলোর মানদণ্ড কী?

যারা ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের ক্ষেত্রে উত্তরটা খুব সহজ। আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে এই নৈতিক অবস্থানগুলো গ্রহণ করি। মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বলি। কুরআন এবং সুন্নাহতে যেসব কাজকে নৈতিক বলা হয়েছে, সেগুলোকে আমরা নৈতিক বলি। যেসব কাজকে অনৈতিক বলা হয়েছে, সেগুলোকে অনৈতিক বলি। এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ নৈতিকতা, এটা অপরিবর্তনীয়।

এখন এই নৈতিক অবস্থানগুলোকে আমরা যেহেতু অবজেক্টিভ বলছি, সেহেতু

আমাদের বিশ্বাসে এগুলো বাইনারি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেটা কেমন? পুরো পৃথিবীর সাপেক্ষে এই নৈতিক অবস্থানগুলোকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি, এর বাইরের সব নৈতিক অবস্থানকে আমরা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম বলে চুরি করা অবৈধ এবং অনৈতিক। কেউ যদি এসে বলে চুরি করা বৈধ, আমরা সেটা মানবো না। এই নৈতিক অবস্থান আমাদের নৈতিক অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু সে যদি আমাদেরকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, কেন আমাদের নৈতিক অবস্থানটি সঠিক? কেন এই অবস্থানটি সত্য? 'চুরি করা খারাপ' এই বক্তব্যটা সত্য এটা আমরা কীভাবে প্রমাণ করতে পারি?

এর উত্তরটাও সহজ। আমরা দাবি করি, ইসলাম এই পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কতৃক মনোনীত ধর্ম। তিনি এই কুরআন পাঠিয়েছেন। অসংখ্য নবি-রাসূলের পর মুহাম্মাদ ﷺ-কে শেষ-নবি করে পাঠিয়েছেন। তাই কুরআন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাহই নৈতিকতার একমাত্র মানদণ্ড এবং সত্য। কেননা তা স্রষ্টার পক্ষ থেকে। আর স্রষ্টাই মানুষের ভালো-মন্দ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখেন। তাই তিনি যা ভালো হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তা ভালো। তিনি যা খারাপ বলে চিহ্নিত করেছেন, তা খারাপ। ১+১=২ এটা যেমন সত্য, স্রষ্টার নির্ধারিত নৈতিকতাও আমাদের কাছে সত্য। এক্ষেত্রে কেউ ইসলামের সত্যতার প্রমাণ চাইতে পারে, সেটা ভিন্ন আলোচনা।

কিন্তু..

স্রষ্টার নির্ধারণের বাইরে কি নৈতিকতা থাকতে পারে? মানুষ কি ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে পারে? যদি সত্যিই পেরে থাকে, তবে সেই নির্ধারণের মানদণ্ড কী? সবাই কি একইরকম করে চিন্তা করে? সবার কাছে কি একই জিনিস নৈতিক কিংবা অনৈতিক? কারও কাছে চুরি করা অপরাধ, কেউবা আবার দারিদ্রের দোহাই দিয়ে চুরিকে বৈধ মনে করে। তাহলে? কার মতামত গ্রহণ করা হবে? কীভাবে হবে নৈতিক-অনৈতিক নির্ণয়? এখান থেকেই আসে সাবজেক্টিভ নৈতিকতার ধারণা। যেই ধারণা বলে ধ্রুবভাবে নৈতিক কিংবা অনৈতিক বলে কিছু নেই। নৈতিকতা স্থান-কাল-পাত্রভেদে বদলাতে পারে, এটাই তাদের ভাষ্য। তবে আমার আজকের আলোচনা এদের নিয়ে নয়।

আমাদের আজকের আলোচনা এমনকিছু মানুষ নিয়ে যারা নিজেরাই নিজেদের নৈতিকতা তৈরি করেছে। ইতিহাস তাদেরকে লিবারেল নামে চেনে। এদের মধ্যে আসে জন লক, এমানুয়েল কান্ট, জেরেমি ব্যান্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং জন রলসদের নাম। এরাই বিভিন্ন ধাপে লিবারেলিজম নামক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদের অধিকাংশই হচ্ছেন স্রষ্টায় অবিশ্বাসী। কিন্তু তারপরও

তারা নৈতিকতা পরিমাপের কিছু ভিত্তি তৈরি করে গেছেন।

তাদের প্রধান আলোচনা ছিল 'ব্যক্তিস্বার্থ' কেন্দ্রিক। তারা বিশেষভাবে ব্যক্তির সুখ, ব্যক্তির স্বাধীনতা এসব নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। কেউ প্রেয়োবাদী (hedonistic) নীতি ব্যবহার করেছেন (ব্যক্তি যেটায় সুখ পায়, সেটাই নৈতিক আর যেটায় দুঃখ পায়, সেটা অনৈতিক), কেউ ব্যবহার করেছেন উপযোগবাদী (utilitatian) নীতি (সুখের সর্বোচ্চকরণ, ব্যাথার সর্বনিম্নকরণ; সামষ্টিক অর্থে), কেউ সাথে জুড়ে দিয়েছেন অপকার (harm) নীতি (যতক্ষণ না অন্য কারও ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ যা ইচ্ছা করো)।

দার্শনিক জন লক যিনি কি না লিবারেলিজমের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়, স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েও কেন প্রেয়োবাদী নীতি ব্যবহার করেছিলেন সেই প্রশ্ন প্রথমেই তোলা যায়। তিনি যদি স্রষ্টায় বিশ্বাসই করেন, তবে কেন তিনি বিশ্বাস করবেন না যে, স্রষ্টা মানুষকে কিছু নৈতিকতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন? আর যদি তিনি বিশ্বাস করে থাকেন যে, স্রষ্টা নৈতিকতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তবে তিনি কেন ভাবলেন সেটা প্রেয়োবাদী নীতিই? কীভাবে তিনি প্রমাণ করবেন স্রষ্টার নির্ধারিত নীতিটাই প্রেয়োবাদী নীতি? আর যদি ভাবেন, তিনি নিজেই এটা উদ্ভাবন করেছেন, তবে তার এই ভাবনার মানদণ্ড কী? কীসের ওপর ভিত্তি করে তিনি বলছেন যে, মানুষ যেটা করতে সুখ বোধ করে সেটাই নৈতিক, যেটা করতে ব্যথা বোধ করে, সেটা অনৈতিক? আদতে তার এই তত্ত্ব মূলত গ্রিক পুরাণ থেকে অনুপ্রাণিত। গ্রিক পুরাণের একজন দেবতার নাম হেডোন, যে 'সুখের দেবতা' হিসেবে পরিচিত।

জন লকের পরের লোকজন এসে তার প্রেয়োবাদী নীতি (Hedonistic Principle) বাতিল করে দিলেও সনাতনী সুখ-বেদনার তত্ত্ব থেকে বের হতে পারেননি। জেরেমি বেন্থাম প্রেয়োবাদী নীতিকে কাটছাঁট করে উপযোগবাদী নীতি (Utilitatian Principle) প্রবর্তন করেন, যার স্লোগান ছিল, 'greatest good for the greatest number'। অর্থাৎ, 'অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সুখ নিশ্চিত করা।' এই তত্ত্ব দিতে গিয়ে ব্যান্থাম 'সুখের দেবতা' এবং 'দুঃখের দেবতা' চিহ্নিত করেন আলাদা আলাদা করে। অর্থাৎ, পৌরাণিক কাহিনী থেকে বের হতে পারেননি তারা!

এরপর জন স্টুয়ার্ট মিল এসে বেন্থামের উপযোগবাদী নীতিকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দেন একটা 'গণধর্ষণ দৃশ্য' কল্পনা করিয়ে। যেখানে তিনি দেখান, গণধর্ষণে অধিক মানুষের সুখ নিশ্চিত হচ্ছে, কিন্তু সেটি নৈতিক নয়। তাই তিনি নিয়ে আসেন যুগান্তকারী 'অপকার নীতি' (Harm Principle)। অর্থাৎ, যতক্ষণ না কারও ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ যা ইচ্ছা করা যাবে। শুনতে অবশ্যই আগ্রহ উদ্দীপক। কিন্তু লক আর বেন্থামের তত্ত্বে যেমন শুভঙ্করের ফাঁকি ছিল, তেমন কিন্তু মিলের তত্ত্বেও আছে।

এই যে অপকার নীতি তিনি দিলেন, এই অপকারটা কি স্বল্পস্থায়ী নাকি দীর্ঘস্থায়ী অপকার? এটা তিনি নির্দিষ্ট করেননি। কোনটা অপকার আর কোনটা অপকার না, এটা কে ঠিক করবে? সবাই একই বিষয়কে অপকার মনে করবে কি? যদি না করে, তবে কি এটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাবজেক্টিভ হয়ে গেল না? একটি উদাহরণ দিই। ব্যভিচার বা বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক কিন্তু মিলের মতে অবৈধ না, যেহেতু এটার প্রত্যক্ষ বা স্বল্পস্থায়ী কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি? ব্যভিচারের ফলে পরিবার ভাঙন হচ্ছে, সন্তানদের মানসিক বিকাশ নষ্ট হচ্ছে, এগুলো কি ক্ষতি নয়? এগুলো কি অপকার নীতির আওতায় আসবে? আবার এই অপকার নীতির আওতায় তো 'ইনসেস্ট/অজাচার'ও আসে না, তবে কি সমাজে অজাচার (পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক) বৈধ হয়ে যাবে? এরকম বেশ কিছু প্রশ্ন এসে যায় এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে। আর বেশিরভাগই সদুত্তর মেলে না।

ছোটখাটো ত্রুটি ছাড়াও এসব দার্শনিকের এই তত্ত্বে একটি বড়সড়ো ত্রুটি আছে। কী সেই ত্রুটি? ঐ যে, প্রমাণহীনতা। জন লক 'সুখ-বেদনা' এর কথা বললেন, জেরেমি ব্যান্থাম, মিল সবাই একই কথা বললেন। অধিক সুখ আর কম দুঃখ নিশ্চিত করো। কিন্তু তারা কেউ এটা বললেন না, যেটা করে মানুষ 'সুখ' পায় ওটাই যে 'ভালো' এর প্রমাণ কী? এটা তারা কীভাবে প্রমাণ করতে পারেন? মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটা প্রমাণ করতে গিয়ে মিলস একটা হাস্যকর যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

'কোনো একটা জিনিস মানুষ দেখে তার মানে ঐ জিনিস দেখার যোগ্য। কোনো একটা শব্দ মানুষ শোনে, তার মানে ঐ শব্দ শোনার যোগ্য। একইভাবে মানুষ যেটা চায়, সেটা আসলে চাওয়ার যোগ্য।'

এটাকে অনেক দার্শনিক ভ্রান্তিমূলক বক্তব্য বলেছেন। আর তাছাড়া কোনো একটা কাজ চাওয়ার যোগ্য বা 'desirable' হলেই সেটা 'ভালো' হবে তার প্রমাণ কী? অর্থাৎ, উত্তর কিন্তু মিলছে না!

জন লক কিংবা মিলের জবাব দিতে ব্যর্থ হওয়ার পর জন রলস এই নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে আসেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, গোঁজামিল না দিলে এই জায়গায় বাঁচা যাবে না। তাই তিনি বলেন, মানুষের 'যৌক্তিক চাওয়া' (rational desire) হচ্ছে 'ভালো' অথবা 'নৈতিক'। এটাও অস্পষ্ট। যৌক্তিক চাওয়া বলতে কী বুঝিয়েছেন তিনি? সব মানুষের যৌক্তিক চাওয়া কি এক? আর যৌক্তিক চাওয়া নৈতিক হওয়ার যুক্তি কী?

পাঠক, খেয়াল করে দেখুন, লিবারেলিজম যেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা একেবারেই নড়বড়ে এবং প্রমাণবিহীন। তারা তাদের প্রাথমিক মূলনীতি প্রমাণ

করতে ব্যর্থ। তারা এমনকি তাদের প্রাথমিক মূলনীতিতে বেশকিছু বাক্য অস্পষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন!

অথচ আজকের বিশ্বে লিবারেলিজমের জয়জয়কার। পাশ্চাত্য চলে লিবারেল নীতিতে। ব্রিটিশ আইন লেখাই হয়েছিল জন লকের কথাবার্তার আদলে। আমেরিকান সংবিধানও লিবারেল। অথচ লিবারেলিজমের প্রাথমিক মূলনীতিগুলো অস্পষ্ট, অসত্যায়িত। আজও যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, 'সমান-অধিকার', 'ব্যক্তিস্বাধীনতা', 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' এগুলো কেন সত্য? এগুলো কেন মানতে হবে? এগুলো কেন সার্বজনীন? লিবারেল 'মানবাধিকার' এর নৈতিক বুনিয়াদ যেখানে অপ্রমাণিত, সেখানে কেন মানবাধিকার সার্বজনীন ও অলঙ্ঘনীয়? কেন এই লিবারেল মানবাধিকার সারাবিশ্বকে মানতে হবে? কেন এগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় ধর্মকে তার বিধান পরিবর্তন করতে হবে? কেন এগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক বিধান কোনো ধার্মিক পালন করতে গেলে তাকে 'উগ্রবাদী', 'র‍্যাডিকেল', 'জঙ্গি' তকমা দেয়া হবে? অপ্রমাণিত লিবারেলিজমের শাসন, আদেশ-নিষেধ মেনে নিতে অন্যরা কেন বাধ্য? এসব প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে না। অনেকটা অভিষেক উপলক্ষে বরের মতোই আমতা আমতা করবে লিবারেল আইনের ধারক-বাহক এসব বেদ্বীনরা।

অথচ আমরা যেন প্রতিযোগিতা করছি তাদের আইনগুলোকে, তাদের সংস্কৃতিগুলোকে আঁকড়ে ধরার জন্য! যেই আইনগুলো তারা কয়েকশ বছর থেকে বিনা জিজ্ঞাসায় মেনে আসছে কোনো প্রশ্ন করা ব্যতীত। যেমন- প্রাচীন গ্রিসের লোকজন গ্রিক দেবতাদের মানতো। অথচ সেসব দেবতার নেই কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি, নেই কোনো প্রমাণ, নেই কোনো যুক্তি! শুধুই কল্পনা, রূপকথা, কতিপয় মানুষের মুখে বানানো গল্প। সেই গল্প মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী মেনে এসেছে। এখন লিবারেলরাও তেমন করছে। সময় এসেছে তাদের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার, তাদের প্রাথমিক মূলনীতিগুলোর সত্যতা জানতে চাওয়ার। জোর গলায় বলতে হবে, 'প্রমাণ দাও!'[২২]

ডারউইনিজম নিয়ে কিছু কথা...

ড. সাইফুর রহমান

‘ডারউইনিজম’, ‘বিবর্তনবাদ’, ‘নাস্তিকতা’ ইত্যাদি কথাগুলোর সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। ‘ডারউইনিজম’, ‘বিবর্তনবাদ’ নামগুলো শুনলে অনেকে বুঝে অথবা না-বুঝে পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ‘বিবর্তন’ বা বিবর্তনবাদ শব্দটি শুনলেই আমরা মনে করি, এটা ডারউইন আর নাস্তিকদের সম্পত্তি; তাই ধর্মবিশ্বাসী অনেকেই চোখ বন্ধ করে এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নেয়, যেটা আসলে সঠিক নয়।

জীববিজ্ঞানের ভাষায় বিবর্তন হলো জীবের বৈশিষ্টের ধারাবাহিক পরিবর্তন। প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বর আগেও বিবর্তন নিয়ে অনেক তত্ত্ব ছিল। বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস, পিয়েরে লুইস মৌপার্টিয়াস, ব্যাপ্টিস্ট ল্যামার্কস-সহ অনেকে বিবর্তন নিয়ে কাজ করেছেন।

ডারউইনের সাফল্য হলো, সে সর্বপ্রথম বিবর্তনের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। ডারউইনের দেয়া বিবর্তনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জীবের মধ্যকার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয় ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ (Natural selection) এর মাধ্যমে। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সে-ই বেঁচে থাকে—সোজা বাংলায় বলতে গেলে এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব। আমরা অনেকে ডারউইনিজম ও প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব একই জিনিস মনে করি, যেটা আসলে ভুল।

ডারউইন ছাড়াও আরও অনেক বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। যেমন : আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (ডারউইনের সহকর্মী), উইলিয়াম চার্লস ওয়েলস, প্যাট্রিক ম্যাথিউ তাদের মধ্যে অন্যতম।

'ডারউইনিজম' হলো বিজ্ঞানী ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের নিজস্ব ব্যাখ্যা। পরবর্তীতে হার্বার্ট স্পেন্সার এই তত্ত্বকে 'সারভাইভাল অফ দ্যা ফিটেস্ট' বা যোগ্যতরের টিকে থাকা নামে কিছুটা ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করেন। ডারউইন তার 'ওরিজিন অফ স্পেসিস' বইতে 'সকল জীব একই আদিরূপ থেকে এসেছে'—বলে যে মতামত দিয়েছেন এটাও ডারউইনিজমের অন্যতম একটা মতবাদ।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন আরও দশটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বর মতোই আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। তৎকালীন অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানী যেমন, কার্ল ফন নাগেলি, উইলিয়াম থম্পসন, ফ্লেমিং জেনকিন তার ব্যাখ্যার বিপক্ষে দারুণ সব বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপন করেন। ফলস্বরূপ ডারউইনকে তার বইতে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়। উল্লেখিত বিজ্ঞানীগণ অ্যাকাডেমিকভাবে ডারউইনের থেকে অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো, ডারউইনের সময়েই খুব অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী বিবর্তনের সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সম্পৃক্ততা স্বীকার করত, অধিকাংশের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন খুবই নগণ্য একটা ভূমিকা পালন করে এ ক্ষেত্রে। বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রায় মৃত্যুশয্যায় চলে যায়। সামগ্রিকভাবে সবাই বিবর্তন তত্ত্ব মেনে নিলেও প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে অগ্রহণযোগ্য বলে রায় দেন অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানী যেমন, এবেরহার্টেড ডেনার্ড, ভার্নন কেলোগ-সহ আরও অনেকে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের বিপরীতে আরও চারটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা পায় তার মধ্যে 'সালট্যাশনিজম' (Saltationism) অন্যতম।

এই বিবর্তনের কাঠামোটা ডারউইনের থেকে পুরোপুরি আলাদা। ডারউইন যেখানে বলেছিল, বিবর্তন ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে হয়, সেখানে 'সালট্যাশনিজম' তত্ত্ব অনুসারে 'দ্রুত বৃহৎ মিউটেশন' এর মাধ্যমে বিবর্তন সংঘটিত হয়। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মধ্যে জেনেটিক্সের প্রাণপুরুষ হুগো দ্যা ভ্রেইস থেকে শুরু করে আধুনিককালের কার্ল ভয়েস, নোবেল জয়ী বারবারা ম্যাক ক্লিনটকও আছেন। মডার্ন মলিকুলার বায়োলজি সমর্থিত এই তত্ত্বটি অন্য সব তত্ত্ব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

ওপরের সংক্ষেপিত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার, বিবর্তনবাদের ওপরে আদি থেকে আজ পর্যন্ত যত তত্ত্ব পাওয়া যায়, তার মধ্যে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে অনির্ভরযোগ্য ও অপ্রায়োগিক। প্রশ্ন হতে পারে, তারপরেও বাকি সব তত্ত্ব থেকে ডারউইনের তত্ত্ব কেন বেশি আলোচিত ও সমালোচিত? এর পেছনেও অনেক কারণ আছে; তবে তার যতটা না বৈজ্ঞানিক তার থেকেও সামাজিক ও রাজনৈতিক।

ডারউইনিজম নিয়ে বিস্তারিত বলার আগে বিবর্তন নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। বিবর্তন নিয়ে অনেকের মাঝে অস্পষ্টতা আছে। আগেই বলা হয়েছে, বিবর্তন হলো জীবের জন্মগত বৈশিষ্টের ধারাবাহিক পরিবর্তন। বিবর্তনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—ম্যাক্রো বিবর্তন বা বৃহৎ বিবর্তন ও মাইক্রো বা ছোট বিবর্তন। আমরা সবাই সাধারণত ম্যাক্রো বিবর্তন নিয়ে কথা বলি, তর্ক-বিতর্ক করি।

ম্যাক্রো বিবর্তন তত্ত্ব মতে জীবের টার্ন্সফর্মেশন বা রূপান্তর, এক জীব থেকে আরেক জীবে পরিণত হওয়া সম্ভব। সাইন্টিফিক তথ্য অনুযায়ী জীবের এই পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন সম্ভব নয়, বিশেষ করে বহুকোষী (মাল্টিসেলুলার) জীবের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কিছু গবেষণা আছে যেখানে দেখা গেছে কিছু এককোষী প্রোক্যারিওটগুলোর মধ্যে জিনগত সাদৃশ্য অনেক।

যেমন : কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির মধ্যে জিনগত সাদৃশ্যতা অনেক; এই সাদৃশ্যতা হয়তো ইভোল্যুশনারী মেকানিজমের মাধ্যমে হয়েছে। এককোষী জীবে বিবর্তন হওয়া খুবই সম্ভব এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

সমস্যা হয় তখন, যখন আমরা এই কাঠামো মাল্টিসেলুলার বা বহুকোষী প্রাণী যেমন, পশু-পাখি, উদ্ভিদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একইরকম সহজ ও সরল মনে করি। আমরা সবাই কমবেশি আদি ও প্রাকৃত কোষের পার্থক্য ছোটবেলায় পড়েছি। এই দুই প্রকার কোষের স্ট্রাকচারাল/কাঠামোগত পার্থক্য আকাশ-পাতাল। তাদের রিপ্রোডাকশন/প্রতিলিপি তৈরির প্রদ্ধতি একেবারেই আলাদা।

উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে; ব্যাকটেরিয়া (এককোষী) যেখানে-সেখানে জন্মাতে পারে, একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া হতে ৪ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে, পক্ষান্তরে একটা এনিম্যাল সেল (কোষ) থেকে আরেকটা হতে কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এই রকম হাজারো উদাহরণ দেয়া যাবে, যা থেকে এটাই স্পষ্ট হবে, এককোষী আর বহুকোষী জীবের মধ্যে আদৌ কোনো মিল নেই। তাই ব্যাকটেরিয়াতে বিবর্তন হলেই এটা বলে দেয়া চূড়ান্ত বোকামি যে, বহুকোষী জীবেও বিবর্তন (ম্যাক্রো) হয়।

বহুকোষী জীবে মাইক্রো বিবর্তন প্রতিনিয়ত হচ্ছে। প্রধানত মিউটেশন (জিনের গঠনগত পরিবর্তন), জিন ফ্লো, জেনেটিক ড্রিফট (জিনের স্থানান্তর) ইত্যাদি কারণে প্রাণীদেহে মাইক্রো বিবর্তন হয়। আমাদের যে ক্যান্সার হয়, এটাও একপ্রকার বিবর্তন (মাইক্রো)। ক্যান্সার হলে কোষের ডিএনএ-এর স্বাভাবিক গঠন পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে অনিয়ন্ত্রিত কোষ-বৃদ্ধি হয়, কিছু প্রোটিন বা মলিক্যুলের উৎপাদন কমে বা বেড়ে যায়; কিন্তু এর ফলে মানুষ কখনো বানর বা হনুমান হয়ে যায় না!

মূলকথা হলো, মাইক্রো বিবর্তনের মাধ্যমে দেহের বিশেষ করে, কোষের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু তাতে এক ধরনের প্রাণী/উদ্ভিদ অন্য কোনো প্রাণী বা উদ্ভিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় না বা বাইরের (ফেনোটিপিক্যাল) গঠনগত পরিবর্তন হয় না।

আরও একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, আমরা প্রায়ই শুনি বানর, শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের ডিএনএ-এর অনেক মিল, তাই আমরা ধরে নিতেই পারি এদের সাথে হয়তো আমাদের এক কালে সাদৃশ্যতা ছিল। এটাও অজ্ঞতার এক বহিঃপ্রকাশ।

যারা মলিকুলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিজ্ঞান ভালো জানে তাদের জন্য বোঝা অনেক সহজ, ডিএনএ-এর মিল থাকলেই সবকিছু হয়ে যায় না। ডিএনএ-ই শেষ কথা নয়, ডিএনএ থেকে আরএনএ হয়, তার পরে প্রোটিন তৈরি হয়। প্রোটিন হলো সবকিছুর মূলে। অনেকেই জানে না, একই জিন (পার্ট অফ ডিএনএ) থেকে বিভিন্ন ধরনের আরএনএ তৈরি হতে পারে, একই আরএনএ বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরি করতে পারে, একই প্রোটিনের বিভিন্ন আইসোফর্ম (দেখতে একই কিন্তু কাজ আলাদা) থাকতে পারে। তার মানে ডিএনএ-এর মিল হলেই সবকিছু হয়ে যায় না। ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ আর আমাদের ডিএনএ একই জিনিস দিয়ে তৈরি; তাই বলে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ যে কাজ আমাদের ডিএনএ কি একই কাজ করে? অবশ্যই না। প্রাণীদের ডিএনএ-এর সাদৃশ্য থাকতে পারে এবং থাকাটা স্বাভাবিক; মূল পার্থক্য হলো, তাদের কাজে এবং এখানেই সবাই স্বাতন্ত্র ও আলাদা।

'বিজ্ঞানী' ডারউইনকে আসলেই 'জীববিজ্ঞানী' বলা যায় কি না তা নিয়ে অনেক সন্দেহ আছে, বিশেষ করে ডিএনএ-এর গঠন জানার পরে তার দেয়া 'তত্ত্ব' কোনোমতেই আধুনিক জীববিজ্ঞানের অংশ হতে পারে না। বিত্তশালী পরিবারের সন্তান ডারউইন প্রথমে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার জন্য স্কটল্যান্ডের এডিনবুর্গে যান, পড়াশোনা শেষ না করেই চলে আসেন। তার পিতা প্রচণ্ড হতাশ হয়ে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দেন, যাতে সে রেক্টর বা ক্লারিক জাতীয় সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে। সেটা করতেও সে ব্যর্থ হয়, পরে ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রী নেন।

প্রভাবশালী ও ধনবান পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার পেছনে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করতে পিছপা হননি। নিজ উদ্যোগে জীববিজ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাসের ওপর পড়াশোনা করেন। পরে ক্যাপ্টেন রবার্ট ফিটজরয়ের নেতৃত্বে জাহাজ এইচ.এম.এস বিগলে করে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছেন, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার গালাপস দ্বীপে অনেক দিন অতিবাহিত করেন। সেখানকার

জীববৈচিত্র, সাথে আদি মানুষদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন, এবং লিখে ফেলেন তার আলোচিত 'অরিজিন অফ স্পেসিস' বই।

এখানে প্রায়োগিক বিজ্ঞান বলতে কিছু ছিল না, পুরোটাই তার মনগড়া নিজস্ব জীবনদর্শন। ডারউইন অবশ্যই প্রচন্ড মেধাবী একজন মানুষ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনোমতেই তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা অনুযায়ী 'জীববিজ্ঞানী' বলা চলে না।

এবার 'তত্ত্ব' নিয়ে কিছু বলা যাক। তত্ত্ব হলো যুক্তি তর্কহীন অনুমান নির্ভর কিছু প্রস্তাবনা, সেটা সঠিক/ভুল যেকোনো একটা হতে পারে। একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, বিজ্ঞানের অন্য সব শাখায় 'তত্ত্ব' গ্রহণযোগ্য হলেও 'জীববিজ্ঞানের' ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারে অপ্রমাণিত 'তত্ত্ব' অসার একটা জিনিস। পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব', কম্পিউটার বা টেলিকমুনিকেশনে ক্লাউডে শ্যাননের 'ইনফরমেশন তত্ত্ব', প্রায়োগিক গণিতশাস্ত্রের জন নিউম্যানের 'গেম তত্ত্ব', রসায়নে লাভসিওরের 'অক্সিজেন দহন তত্ত্ব', ম্যাক্স প্লাঙ্কের 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব', স্টাটিস্টিকের টমাস ব্যাসের 'বেইস তত্ত্ব'-সহ আরও অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে যেগুলো এখনো প্রয়োগসাধ্য ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

পদার্থ বা গণিতশাস্ত্রে একটা তত্ত্ব দাঁড় করাতে একটা কাগজ আর পেন্সিলই যথেষ্ঠ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার পড়ে না। উদাহরণ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। জীববিজ্ঞানে আপনি চাইলেই আপনার মনগড়া 'তত্ত্ব' বানাতে পারেন না। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ ছাড়া জীববিজ্ঞান কোনোকিছুই বিশ্বাস করে না।

আধুনিক কম্পিউটেশনাল বায়োলজি বা গণনামূলক জীববিজ্ঞানে অনেক সময় সিমুলেশন বা ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংয়ের মাধ্যমে অনেক কিছু প্রেডিক্ট/অনুমান করা হয়। বাস্তবে যখন বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে পরীক্ষা করা হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বানুমান ভুল প্রমাণিত হয়। জীববিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞানের অন্য কোনো শাখা এত রহস্যময়, জটিল ও বৈচিত্রময় নয়। আরও বলে রাখা ভালো, মানুষ মঙ্গলে পা রাখতে চলেছে, ইলেক্ট্রন, প্রোটন নিয়ে কাজ করছে, রোবট বানাচ্ছে আরও কত উন্নত প্রযুক্তি আমাদের সামনে, তারপরেও এখন পর্যন্ত আমাদের ডিএনএ-এর ৯০ ভাগেরও বেশি অংশের কী কাজ তা আমরা জানতে পারিনি। এত জটিল একটা বিষয়ে একজন মানুষ বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে, কিছু বানর, হনুমান, আর জংলী মানুষদের সাথে থেকেই 'জীববিজ্ঞানের' তত্ত্ব দিয়ে দিল, আর কোটি কোটি মানুষ সেটা এইযুগেও বিশ্বাস করে চলেছে। ভাবতেই আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে শঙ্কিত হই।

এবার জেনে নিই ডারউইনের বিবর্তনবিষয়ক তত্ত্ব সম্পর্কে তার সামসময়িক প্রথিতযশা ও আধুনিক বিজ্ঞানীরা কে কী বলেছেন। বিখ্যাত ড্যানিশ এম্ব্রায়োলজিস্ট সোরেন লোভট্রপ তার বই Darwinism: The Refutation of a Myth এ লিখেছেন,

'...the reasons for rejecting Darwin's proposal were many, but first of all that many innovations cannot possibly come into existence through accumulation of many small steps, and even if they can, natural selection cannot accomplish it, because incipient and intermediate stages are not advantageous.'

ক্যামব্রিজে পড়াশোনা করা বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ এডাম সিজুইক ডারউইনিজম নিয়ে তামাশা করেছেন—

'...parts (of Darwin's Origin of Species) I laughed at till my sides were almost sore...'

ব্রিটিশ বায়োলজিস্ট জর্জ জ্যাকসন এই তত্ত্বকে 'The Incompetency of Natural Selection' বলে অবহিত করেছেন। মার্কিন বায়োলজিস্ট লুইস অগাস্টের মন্তব্য—

'There are...absolutely no facts either in the records of geology, or in the history of the past, or in the experience of the present, that can be referred to as proving evolution, or the development of one species from another by selection of any kind whatever.'

আরেক বিখ্যাত মার্কিন গণিত ও পদার্থবিদ উলফস্গং স্মিথ তার Teilhardism and the New Religion বইতে বলেছেন—

'Evolutionism is in truth a metaphysical doctrine decked out in scientific garb.'

একজন মার্কিন 'আধুনিক এভোল্যুশনারী' তত্ত্বস্ট মাইকেল বিহি তার Darwin's Black Box বইতে নিও-ডারউইনিজমকে 'A minor twentieth-century religious sect' বলে উল্লেখ করেছেন।

'Ultimately the Darwinian theory of evolution is no more nor less than the great cosmogenic myth of the twentieth century'—কথাটা বলেছেন বিখ্যাত ব্রিটিশ বায়োকেমিস্ট মাইকেল ডেনটন তার 'Evolution : A Theory in Crisis' বইতে।

ডারউইনের সামসময়িক বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী, স্যার রিচার্ড ওয়েন তার Darwin on the Origin of Species বইতে ডারউইনের তত্ত্বকে ধুয়ে দিয়েছেন। এই রকম

উদাহরণ অসংখ্য দেয়া যাবে, যারা ডারউইনের এই আষাঢ়ে গল্প নিয়ে হাসি-তামাশা করেছেন।

আরও একটা বিষয় আপনাদের জানানো দরকার, ডারউইনকে ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরাই আধুনিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের কোনো বিজ্ঞানী মনে করে না। সাধারণত ইউরোপ-আমেরিকাতে বড় বড় বিজ্ঞানীদের নামে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন : স্যাঙ্গার ইনস্টিটিউট, ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, পাস্তর ইনস্টিটিউট, সাল্ক ইনস্টিটিউট, গর্ডন ইনস্টিটিউট, ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউট, ওয়াটসন স্কুল অফ বায়োলজিক্যাল সাইন্স, এই রকম আরও অনেক নাম দেয়া যাবে, যেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদেরকে সম্মান জানানো হয়েছে তাদের নামে নামকরণের মধ্য দিয়ে। অবাক করা বিষয় ডারউইনের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীর(!) নামে জীববিজ্ঞানের কোনো ইনস্টিটিউটের নামকরণ হয়নি এখন পর্যন্ত! তার মানে ডারউইনের দেশের মানুষরাই তাকে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় কোনো বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না।

আরও একটি তথ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত এই লেখাটি শেষ করছি; সেটা হলো, বিবর্তন (ম্যাক্রো) এর পক্ষে এখনো কোনো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, গবেষণাগারে অনেক তত্ত্বের প্রমাণ মিললেও ডারউইনের তত্ত্ব এখনো প্রমাণ করা যায়নি।

ইলিয়াড, ট্রয় ও নিরীশ্বরবাদ

আশিক আরমান নিলয়

পাশ্চাত্যের চর্যাপদ

পশ্চিমা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধারণা করা হয় মহাকাব্য দ্য ইলিয়াডকে। দ্য ইলিয়াড এর রচয়িতা কে, কেবল একজনই এর রচয়িতা কি না—এসব বিষয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এর রচয়িতা হোমার। স্পার্টার রানি হেলেনের সাথে ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের পরকীয়া এবং তার জের ধরে গ্রিক জোট ও ট্রয়ের মধ্যকার বিখ্যাত যুদ্ধের একাংশ নিয়েই এই মহাকাব্য। তবে এর কাহিনি বর্ণনা করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। দ্য ইলিয়াড এর মাধ্যমে কীভাবে আজকের নিরীশ্বরবাদী সেক্যুলার চিন্তাকাঠামোর বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করা যায়, এ নিয়েই আজকের আলোচনা।

নেই কোনো একক সত্য

দ্য ইলিয়াড এর কাহিনির চরিত্রগুলো বহুঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক। গ্রিক জোট ও ট্রয়ের এই যুদ্ধে ঈশ্বরেরা সকলে মিলে কোনো এক পক্ষের সমর্থক নয়। প্রধান ও অপ্রধান দেবদেবীরা এখানে নিজ নিজ পছন্দের পক্ষকে—এমনকি পছন্দের ব্যক্তিকে—সাহায্য সহযোগিতা করে। ঈশ্বর বলতেই আমরা বুঝি সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড নির্ধারণকারী। সকল দেবদেবী যদি ট্রয়ের পক্ষে থাকত, তাহলে আমরা বুঝতাম ট্রয় হকের ওপরে আছে। সকল দেবদেবী গ্রিক জোটের পক্ষে থাকলে বোঝা যেত গ্রিক জোট হকের ওপর আছে। কিন্তু দেবদেবীদের দল এখানে দ্বিধাবিভক্ত। পুরো ঘটনায়

তাই কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া যাচ্ছে না যুদ্ধরত দুই পক্ষের মাঝে কে আসলে যালিম, আর কে মাযলুম। এমনকি স্পার্টার রাজা মেনেলাউসের স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিজের করে নেয়া প্যারিসকেও অপরাধী বলা যাচ্ছে না, কারণ সে এই কাজ করেছে দেবী অ্যাফ্রোডাইটির নির্দেশেই!

তাওহীদবাদী ধর্মগুলো ঠিক-বেঠিকের ব্যাপারে বড্ড একরোখা। আল্লাহ্‌ এক। তিনি যা হালাল করেছেন, তা হালাল; তিনি যা হারাম করেছেন, তা হারাম। ইজতিহাদি ব্যাপারে নানারকম মত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে, তবে মূল কাঠামো অপরিবর্তনীয়, সেখানে ভিন্নমত গ্রহণ-অযোগ্য। সেক্যুলার ধর্মের দর্শন এর বিপরীত। নানাজনের নানা মত, একই জিনিস কারও কাছে ঠিক এবং কারও কাছে বেঠিক হতে পারে। সাদা-কালোর মাঝে রয়েছে অনেক ধূসর অঞ্চল। তার মানে 'সত্য' কেবল একটি নয়, কোনো সত্যই পরম নয়। 'সত্য' অনেক। 'বাস্তবতা' অনেক। এর উদাহরণগুলোও চমকপ্রদ। আলো পড়লে কাউকে একটু বেশি ফর্সা লাগে।

টিউবলাইটের আলোতে একরকম ফর্সা, সূর্যের আলোতে আরেকরকম। কোন আলোতে তার গায়ের আসল রঙ দেখা যাচ্ছে? বলতে পারেন কোনো আলো ছাড়াই যেরকম দেখা যায়, সেটাই আসল। কিন্তু বস্তুর ওপর কোনো-না-কোনো আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে না আসলে চোখ তো কিছু দেখতেই পারে না! নিরীশ্বরবাদী দর্শন যেন এদিক থেকে সেই বহুঈশ্বরবাদী দর্শনেরই পুনর্জন্ম।

আপাতদৃষ্টিতে সেক্যুলার দর্শন অনেক সহনশীল। অপরের মতকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। তবে সামগ্রিকভাবে একক সত্যের ধারণাটাকেই এভাবে ধ্বংস করে দেয়ার ধারণাটা ভেতর থেকে দুর্বল। 6-কে উলটো করে লিখলে 9 মনে হয়, M-কে উলটো করে ধরলে W মনে হয়। যে 6M বলছে, তাকেও সম্মান করতে হবে; যারা 9W, 6W বা 9M বলছে, তাদের মতকেও সম্মান করতে হবে। কিন্তু দিনশেষে সবগুলোই সঠিক না। পঞ্চম ফ্লোরের ঠিক ওপরের তলায় 6 লেখা থাকলে বুঝে নিতে হবে সেটি সিক্সথ ফ্লোর। আপনি মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সেটিকে নাইন পড়লেই আপনার মতকে সম্মান করা বাধ্যতামূলক না। সিক্সথ ফ্লোরে বসবাসকারী MAX সাহেবের নাম আপনি উলটো হয়ে XAW পড়লেই হয়ে গেল না।

> 'যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখের ভরে চলে, সে-ই কি অধিক সৎপথপ্রাপ্ত; না কি যে সোজা হয়ে সরল-সঠিক পথে চলে, সে?'[২৩]

[২৩] সূরা মুলক, ৬৭ : ২২।

বর্ণ আর সংখ্যার এই উদাহরণটি কাল্পনিক। কিন্তু বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য। একক সত্যের ধারণাকে অস্বীকার করে জীবন চলে না। প্রথমে হয়তো ধর্মীয় কর্তৃত্বকে উৎখাত করার জন্য 'বহু সত্যে'র এই ধারণাটি প্রচারিত হয়। কিন্তু একবার যখন ধর্মকে উৎখাত করে অধর্ম সিংহাসনে আরোহণ করে, তখন সে-ও নিজেকে একক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তখন ধর্মীয় সত্য দিয়ে সেক্যুলার 'সত্য'কে আক্রমণ করলেই অধর্মের দাঁত-নখ বেরিয়ে আসে। স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরমতসহিষ্ণুতার সেক্যুলার মিথ আসলে কতটা দুর্বল।

আগেও বলা হয়েছে যে, ইসলামের একক সত্যের ভেতর ইজতিহাদগত বিভিন্ন বৈচিত্র্য থাকতে পারে। কিতাবে যেই সিদ্ধান্ত সরাসরি দেয়া নেই, তা গবেষণা করে বের করতে গেলে দুজন গবেষকের মাঝে মতানৈক্য হতেই পারে—এটি প্রথম যুগ থেকেই ইসলামে স্বীকৃত। যার একটি উদাহরণ হলো, একাধিক মাযহাবের অস্তিত্ব এবং একই মাযহাবের দুই বা ততোধিক আলিমের মধ্যকার মতানৈক্য। মাযহাবগুলোর মধ্যে যত দাঙ্গা হয়েছে ও হচ্ছে, সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু মাযহাবের অস্তিত্ব এবং মাযহাবের ব্যাপারে উম্মাহর আলিমগণের নীতিমালা থেকেই বোঝা যায়, ইসলামে পরমতসহিষ্ণুতার স্থান কত বিস্তৃত। তবে সেটি ঘটবে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই। দুইজন দুই জায়গায় হাত বেঁধে পাশাপাশি সালাত পড়তেই পারে। কিন্তু আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয়—এ নিয়ে কোনো ভিন্নমত গ্রহণযোগ্য নয়। আবার ইজতিহাদি বিষয়ে দুনিয়ায় অপরের মতকে সম্মান করে চলা যেতে পারে, কিন্তু আখিরাতে সঠিক ইজতিহাদকারী তার আমলনামায় দেখবে দুই নেকি এবং ভুল ইজতিহাদকারী পাবে এক নেকি। কাজেই অপরের মতকে সম্মান করার যেই বয়ান সেক্যুলার দর্শনের ধারকরা নিয়ে এসেছিল, তার এক উন্নততর ও বাস্তবসম্মত সংস্করণ আগে থেকেই ইসলামে আছে।

জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই

মেনেলাউস বয়স্ক লোক বটে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানের বীরত্বকে পুরুষত্ব হিসেবে ধরলে স্বামী হিসেবে সে নিতান্ত ফেলনা নয়। প্যারিস যে হেলেনকে খুব অত্যাচারী রাক্ষস স্বামীর হাত থেকে উদ্ধার করে ট্রয়ে নিয়ে গেছে, বিষয়টা এমন নয়। আবার যুদ্ধ পারে না বলে প্যারিসও যে স্বামী হিসেবে খুব খারাপ, তাও নয়। সে নারীদের মন ভোলাতে জানে, দেখতে সুন্দর, প্রেমদেবীর আশীর্বাদ-ধন্য। তাই মেনেলাউস হেলেনকে কোনো ধ্বজভঙ্গ সন্ন্যাসীর হাত থেকে বাঁচাতে ট্রয়ের উপকূলে ধেয়ে এসেছে, এমনটাও বলা যায় না। দশ বছর স্থায়ী রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধ বেঁধে গেল কেবল দুজন (হেলেনকে-সহ ধরলে তিনজন) মানুষের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে।

প্রায়-অমর অ্যাকিলিস ছিল এই যুদ্ধে গ্রিক জোটের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। জোটের নেতা অ্যাগামেমনোনের সাথে মনোমালিন্যের কারণে সে দীর্ঘ সময় যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। মনোমালিন্যের কারণ হলো যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে অ্যাকিলিস যেই মেয়েকে যৌনদাসী হিসেবে পেয়েছিল, অ্যাগামেমনোন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। গোটা কয়েক খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর অ্যাগামেমনোন মরিয়া হয়ে অ্যাকিলিসের সাহায্য চায়। নতুন যৌনদাসী আর উপঢৌকন দিয়ে তার মন গলাতে চায়। অ্যাকিলিস গোঁ ধরে বসে থাকে যে, তার নিজের নৌবহর আক্রান্ত না হলে সে আর অস্ত্র তুলছে না। ঘটনাক্রমে তার ঘনিষ্ঠ অনুজ প্যাট্রোক্লাস নিহত হয় ট্রয়ের যুবরাজ হেক্টর বিন প্রিয়ামের হাতে। গ্রিক শিবিরে খুশির জোয়ার বইয়ে দিয়ে যুদ্ধে পুনঃযোগদান করে অ্যাকিলিস। অর্থাৎ, যুদ্ধ এবং খণ্ডযুদ্ধগুলোর উদ্দেশ্য ছিল কীভাবে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ও বস্তুগত সুখ লাভ করা যায়। পাশের দেশে শান্তি, সাম্য, ন্যায়বিচার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগ ছিল না কোনোটিই।

সর্বোচ্চ বস্তুগত সুখ আস্বাদনকে জীবনের ধ্যান-জ্ঞান বানানোর এই দর্শন অনেক পুরোনো। সংজ্ঞাগত কিছু পার্থক্য সহকারে এর নানারকম নাম রয়েছে। যেমন- হিডোনিজম (প্রেয়োবাদ), কনসিকোয়েনশিয়ালিজম (ফলাফলবাদ), ইউটিলিটারিয়ানিজম (উপযোগবাদ) ইত্যাদি। নিরীশ্বরবাদী চিন্তা এই দর্শনগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হয়। প্রাচীন মতগুলোর সাথে আধুনিক সংস্করণগুলোর পার্থক্য হলো, আধুনিক সংস্করণে 'অন্যের ক্ষতি না করে' অংশটা যোগ করা হয়। অন্যের ক্ষতি না করে আপনি সর্বোচ্চ বস্তুগত সুখ আস্বাদনের জন্য যা খুশি, তা-ই করতে পারবেন। গ্রিক জোট আর ট্রয়ের যুদ্ধে উভয়পক্ষ এবং উভয়পক্ষের ভেতরের ব্যক্তিবর্গ চেয়েছে অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজে সর্বোচ্চ সুখ আস্বাদন করতে।

আধুনিক নিরীশ্বরবাদীরা 'অন্যের ক্ষতি না করে' জীবনের সর্বোচ্চ মজা লোটাকে খারাপ কিছু মনে করে না। যত যা-ই হোক, যেহেতু তাদের মতে ঈশ্বর বলে কেউ নেই, আমাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্বই প্রাকৃতিক নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার ফল, তাই উচ্চতর কল্যাণকর কোনো নিয়মসমষ্টিতে বিশ্বাস করে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। এটার উদাহরণ দিতে একসময় সমকামিতা প্রসঙ্গ আনা হতো। কিন্তু এই বিষয়টিকে নিরীশ্বরবাদীরা এখন এতই হালকা করে ফেলেছে যে, এই উদাহরণ দিয়ে আর মানুষকে ভড়কে দেয়া যায় না। তাই নতুন উদাহরণের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। ২০১৮ সালের ৩রা মার্চ রিচার্ড ডকিন্স নরমাংসভোজনের ব্যাপারে টুইটারে কিছু কথা লিখেন—মৃত মানুষের আর কোনো ক্ষতি করা সম্ভব না। অন্যদিকে খাওয়াদাওয়া করলে জীবিত মানুষ পুষ্টি লাভ করে, তার 'সুখে'র পরিমাণ বাড়ে। ধর্মীয় দর্শনগুলো নরমাংসভোজনের বিরুদ্ধে যেই 'ট্যাবু' তৈরি করেছে,

টিশ্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত নরমাংসের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকেই সেই ট্যাবু ভাঙা যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ডকিন্স।

আল্লাহ-প্রদত্ত একটি সীমায় বিশ্বাস না করলে বস্তুগত সুখ আস্বাদনের এই দর্শন আমাদের অকল্পনীয় সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। গীবত করা হারাম। কেন হারাম? কাউকে না জানিয়ে তার নামে এমন কিছু সত্য কথা বলা হচ্ছে, যা শুনতে পেলে সে মন খারাপ করত। কিন্তু শুনতে তো পাচ্ছে না। উলটো গীবতকারীরা আড্ডা মারার মজা পাচ্ছে। তাহলে গীবত করলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো, আল্লাহ একে হারাম করেছেন। তাই তা করা যাবে না।

> '...একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা কোরো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাকো...'[২৪]

পাথর-শীতল যুক্তির বিচারে গীবত এবং ক্যানিবালিজম (নরমাংসভক্ষণপ্রথা)—কোনোটাই ক্ষতিকর নয়। উলটো উপকারী। তারেক মাসুদের একটা সিনেমায় 'হিল্যা বিয়ে' প্রথার যাঁতাকলে পিষ্ট এক যুবতি বুকফাটা কান্না করতে করতে তার বোন বা এমন কাউকে বলে, 'আমারে বাঁসান, হে অমুক! আমারে বাঁসান!' (উল্লেখ্য, সিনেমা দেখা হারাম এবং সিনেমায় দেখানো হিল্যা প্রথার সাথে বিবাহ-তালাকের ইসলামি বিধানের পার্থক্য ব্যাপক। সে ভিন্ন আলোচনা।) যুক্তি আর বিজ্ঞানমনস্কতার এই যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মানবতাও আজ সেভাবে কাঁদছে, 'আমাকে বাঁচান! কেউ আমাকে বাঁচান!' যুক্তির এই জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় হলো মানবপ্রজাতির যুক্তিবুদ্ধি ব্যবহারের ক্ষমতাকে সৃষ্টিজগতের চূড়া মনে না করা। মানুষের চেয়ে উচ্চতর জ্ঞানসম্পন্ন সত্ত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং তাঁর দেয়া সীমা-পরিসীমা মেনে চলা, তা যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিচারে যতই অবোধ্য হোক। এমনকি যুদ্ধ করলেও তা ভূমি-দখল বা লুটপাটের জন্য না করা। সেই উচ্চতর সত্ত্বার দেয়া সর্বোচ্চ কল্যাণকর আইন-কানুন বাস্তবায়নের জন্য তা করা।

জেনে বা না-জেনে সবাই-ই ধার্মিক, ঈশ্বরের উপাসক

দ্য ইলিয়াড-এ উল্লেখিত ঈশ্বরদের মাধ্যমে হোমার কি সত্যিকারের ঈশ্বরই বুঝিয়েছেন, না কি মানুষদের বিবেকের কণ্ঠটাকেই রূপক আকারে দেখিয়েছেন—এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। হোমারের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অকাট্যভাবে কিছু জানতে না পারলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। পৌত্তলিকদের

[২৪] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২।

এই ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো একদম দৃঢ়ভাবে কোনো কিতাবি নিয়ম-কানুনে বাঁধাধরা নয়। তাই এগুলোকে সুসংগঠিত ধর্ম বলা হয় না, বলা হয় বিলিফ সিস্টেম বা বিশ্বাস পদ্ধতি। এসকল বিশ্বাসে প্রায় প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তিকেই এক একটি দেবদেবী হিসেবে কল্পনা করা হতো/হয়।

> 'এগুলো তো কেবল কতগুলো নাম, যে নাম তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছ৷ এর পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি...।'[২৫]

আজকের দিনে নিরীশ্বরবাদী কাঠামোতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যত মতবাদ রয়েছে, খুব স্পষ্টভাবেই এগুলো একেকটি ধর্ম, যাদের রয়েছে নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনী, ঈশ্বর, চিহ্ন, আচার-প্রথা ও বিধিনিষেধ। এরকম কিছু ধর্ম হলো পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি। এদের 'ধর্ম' বলার কারণ হলো, নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতায় কোনোরকম বস্তুগত অস্তিত্ব ছাড়াই কিছু জিনিস এখানে 'বিশ্বাস' করতে হয়। পুঁজি, প্রলেতারিয়েত শ্রেণি, দেশ—প্রতিটিই নিজ নিজ ধর্মের ঈশ্বর। আব্রাহাম লিংকন, কার্ল মার্ক্সরা নিজ নিজ ধর্মের নবি, যাদের আনীত শারীয়াতকে সেই ধর্মের অনুসারীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। ডাস ক্যাপিটাল বা যেকোনো দেশের সংবিধান সেই সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ। মানবাধিকার নামক নিয়ম পদ্ধতিতে বিশ্বাস করা, বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করা, মাটি ও আকাশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অংশের একটি নির্দিষ্ট নাম আছে বলে বিশ্বাস করা—এগুলো সবই অন্ধবিশ্বাস। এদের পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। পার্থক্য হলো, পৌত্তলিকরা স্বীকার করে যে, তারা একটি ধর্মের অনুসারী।

আধুনিক নিরীশ্বরবাদীরা তা স্বীকার করতে চায় না। 'Imagine a world without religion' (কল্পনা করুন ধর্মমুক্ত এক পৃথিবী) কথাটা তাই অবাস্তব। 'স্বাধীনতাকামী' মানুষ যত দিকেই তাই ছোটাছুটি করুক, ধর্ম ও ঈশ্বরের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। জেনে বা না-জেনে সবাই-ই ধার্মিক, সবাই-ই কোনো-না-কোনো ঈশ্বরের উপাসক।

বিনোদনমত্ততা : সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিক গেইমস

এথিনা, হেরা এবং অ্যাফ্রোডাইটি তিনজন দেবী। রাজপুত্র প্যারিসকে তারা বিচারকের দায়িত্ব দেয় তাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে, তা নির্বাচন করার জন্য। তবে প্যারিসের নিজস্ব বিচারবুদ্ধির ওপর তা ছেড়ে দেয়া হয়নি। তিনজন দেবীই

[২৫] সূরা নাজম, ৫৩ : ২৩।

তিনটি জিনিসের প্রস্তাব দিয়েছে প্যারিসকে। যদি প্যারিস সেই দেবীকে বেছে নেয়, সে তাকে এই উপহার দেবে। তো অ্যাফ্রোডাইটি বলেছিল তাকে নির্বাচন করলে সবচেয়ে সুন্দরী মানবীর সাথে প্যারিসকে মিলিয়ে দেবে সে। প্যারিস তাকেই সবচেয়ে সুন্দরী আখ্যা দিল। কথা অনুযায়ী বিশ্বসুন্দরী হেলেনের সাথে প্যারিসের মিলনের পথ খুলে দেয় অ্যাফ্রোডাইটি। এ নিয়ে পরে গ্রিক জোট আর ট্রয়বাসীর যুদ্ধ বেঁধে গেলে এথিনা আর হেরা গ্রিক জোটের পক্ষ নেয়, অ্যাফ্রোডাইটি পক্ষ নেয় ট্রয়ের।

যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে বিনোদন নিতে ভুলত না কোনো পক্ষই। অবসর সময় পেলে সৈনিকেরা বিভিন্ন খেলাধুলায় মেতে ওঠে। গ্রিক শিবিরে আয়োজিত এমনই এক টুর্নামেন্টের দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে দ্য ইলিয়াড-এ। ঘোড়দৌড়, রথ প্রতিযোগিতা, তলোয়ারবাজি, তিরন্দাজী, কুস্তি-সহ নানারকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। একেক ইভেন্টে অংশ নেয় সেই খেলায় দক্ষতম যোদ্ধারা। বিজয়ীদের জন্য ঘোষণা করা হয় মোটা অংকের পুরস্কার। তখন তো আর ফিয়াট মানি ছিল না। প্রাইজ হিসেবে দেয়া হতো ঘোড়া, রথ, নারী, বর্ম, অস্ত্র, শিরস্ত্রাণ, স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত ট্রফি, মুদ্রা ইত্যাদি। পুরো সেনাবাহিনী মিলে উপভোগ করে একেক ইভেন্টে একেক যোদ্ধার ক্রীড়ানৈপুণ্য।

ঈশ্বরবিহীন একটি পৃথিবীতে যেহেতু বিনোদনই হলো অস্তিত্ববাদী আতংক ভুলে থাকার কার্যকর একটি উপায়, তাই নিরীশ্বরবাদ বিনোদনকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়। এই বিনোদনের বড় দুটি ময়দান হলো শোবিজ এবং ক্রীড়া জগত। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হতে বা নাটক-সিনেমায় ডাক পেতে হলে আগেই নানাভাবে পুরুষ বিচারকদের ঠাণ্ডা করতে হয়, যেমনটা করার চেষ্টা করেছে ওই তিন দেবী। আগে যুদ্ধের ময়দানের ফাঁকেই সক্রিয় যোদ্ধারা খেলাধুলা করত। এখন গণতন্ত্রের যুগে রাজনীতির জটিলতা থেকে জনগণের মুখ ফিরিয়ে রাখতে আয়োজিত হয় এসকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিনোদন জগতের ফলে অর্থনীতি সচল থাকে বটে, কিন্তু অর্থের সুষম বণ্টন হয়ে দারিদ্র্য হ্রাস পায় না। এই বাস্তবতা জানা সত্ত্বেও এগুলোর পেছনে বছর বছর কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ যায়। অল্প কিছু প্রতিবাদকারীর মিছিল, মানববন্ধন, স্লোগানের খবর পত্রিকার এক কোণায় থাকে যদিও।

ধর্মকে বিবেচনায় নিলে বিনোদনের ওপর নানারকম বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়ে যায়। কিন্তু সেসব বিধি-নিষেধে ঐশ্বরিক পরিমিতবোধের ছোঁয়া থাকায় তা মেনে চললে যেমন বিনোদনের অভাবে মানুষ দম বন্ধ হয়ে মারা যায় না, তেমনি জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে বিনোদনের সাগরেই ডুবে যায় না।

শূন্য ও একাধিকের মাঝে

দ্য ইলিয়াড এখানে কেবল উদাহরণ। বহুঈশ্বরবাদের সাথে নিরীশ্বরবাদের আঁতাত নিয়ে লিখতে চাইলে দিস্তার পর দিস্তা লেখা যায়। এখানে উল্লেখিত উদাহরণগুলোকে প্রাথমিক ছাঁচ ধরে পাঠক চাইলে এমন আরও সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। দিনশেষে ওই এক-এ ফিরে যাওয়াটাই সমাধান।

'নারীবাদ' নারীকে বাদ দিয়েই নতুন কোনো চিন্তা নয় তো?

মিসবাহ্ মাহীন

চলুন, প্রথমে একটু রিল্যাক্স করা যাক!

মনে করুন, কেউ আপনার সামনে এসে প্রস্তাব দিল, 'চলুন, একটি দাওয়াত খেয়ে আসি।' আপনার মনে নিশ্চয়ই ভেসে উঠবে মুরগী, খাসি, চিংড়ির বিভিন্ন লোভনীয় পদের সুস্বাদু খাবার। কিংবা মনে করুন, আপনার আদরের ছোট্ট ভাতিজা এসে আপনার কাছে গোঁ ধরে বসল, তাকে আজ চিড়িয়াখানা নিয়ে যেতেই হবে। চিড়িয়াখানার কথা শুনলেই আপনার মনে বাঘ, সিংহ, হরিণের কথা আগে চলে আসবে। তাই না?

আমাদের মস্তিষ্ক এভাবেই কাজ করে। প্রতিটা শব্দের সাথে একটা করে ঘটনা আমাদের মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করে রাখে।

এই তো, চলে এসেছেন আসল জায়গায়!

এবার অপেক্ষাকৃত একটু কঠিন একটি শব্দ দিয়ে ভাবুন। নারীবাদ অর্থাৎ feminism. বলুন তো, মাথায় চট করে কী এসেছে? খুব স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই মাথায় আসে আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপানের মতো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর খুব সকালবেলার একটি চলমান ছবি। যেই ছবিতে আছে অফিস সময়ে এক ঝাঁক নারী অফিসের দিকে যন্ত্রের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। পৃথিবীর তাবৎ শক্তি যেন নারীর এই অপ্রতিরোধ্য গতিকে আটকাতে পারছে না। মেয়েরা খুব হাসিমাখা মুখ নিয়ে তার সামনে বসে থাকা গ্রাহকদের বিভিন্ন পণ্যের ব্যাপারে খুব

চমৎকার উপস্থাপনা করছেন, দেশে বিদেশে নানা জায়গায় একজন নারী সাহসী ভূমিকায় ভ্রমণ করছেন, মাসের শেষে খুব ভালো অংকের বেতন পাচ্ছেন, সেই বেতন দিয়ে খুব ভালোমতো সংসারের খরচ চলে যাচ্ছে, তার পরিবারের স্বামী-শ্বশুর-শ্বাশুড়ি সকলেই খুব খুশি ইত্যাদি।

শুকনো কল্পনার কথা বাদ দিয়ে একটি বাস্তব উদাহরণ দেখলে কেমন হয়, বলুন তো?

হলিউডের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন! অনেকের কাছে একটি স্বপ্নের কারখানা। হলিউড মূলত অভিনেতা নির্ভর একটি ইন্ডাস্ট্রি; আরও অন্যান্য অনেক চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিজের মতো। অভিনেতা নির্ভর হলেও এর মূল আকর্ষণ ছিল সবসময়ই অল্প বয়সী তরুণীরা। মিডিয়া নিয়ে অনেক গুঞ্জন কানে কানে শোনা গেলেও খুব বৃহৎ পরিসরে বোধকরি এ নিয়ে কেউ কখনো উচ্চবাচ্য করেনি। কারণ, এখানে অনেক উচ্চস্বরের আর্তনাদ অনুরণন হয়ে চার দেয়াল শুষে নিয়েছে।

আমাদের সামনে অনেক কিছুই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যেত না, যদি না হলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক হার্ভে উইনস্টেইনের যৌন কেলেঙ্কারির খবর ফাঁস না হতো।[২৬] ২০০৭ সালে একদম প্রথম বারের মতো তারানা বুর্কে নামক একজন নারী যৌন নির্যাতনবিরোধী 'মি টু' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তখন খুব একটা পরিচিতি লাভ করেনি ব্যাপারটা। সবাই আর দশটা সাধারণ ঘটনার মতো এড়িয়ে গিয়েছিল। এর ঠিক ১০ বছর পরে এসে পুনরায় যেন সেই মৃত গাছে পানি দিলেন একজন মার্কিন অভিনেত্রী। অ্যালিসা মিলানো নাম তার। হ্যাশট্যাগ মি টু (#MeToo) দিয়ে শুরু করেন নতুন একটি জাগরণের। হলিউডের মুভি মোগল হার্ভে উইনস্টেইনের যৌন কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশের পরে তিনি তার টুইটার একাউন্ট থেকে টুইট করেন, 'If you've been sexually harassed or assaulted write 'me too' as a reply to this tweet.'[২৭] 'আপনি যদি কখনো যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন, তবে এই টুইটের নিচে উত্তর হিসেবে লিখুন 'me too' (অর্থাৎ আমিও একজন ভুক্তভোগী জীবনের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে)।' সাথে সাথে হাজার হাজার রিটুইট আসে। অনেকেই তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। মুহূর্তেই তা বিদ্যুৎগতিতে সমগ্র বিশ্ব নাড়িয়ে দেয়।

এই তালিকায় অনেক স্বনামধন্য মহিলার নামও ছিল। যেমন- লেডি গাগা, গ্যাব্রিয়েল

[২৬] https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html (সতর্কতাঃ বেপর্দা নারীর ছবি আছে)
[২৭] https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/upload/report.pdf

ইউনিয়ন, প্যাট্রিশিয়া আরকুয়েইট, ডেব্রা মেসিং, রোজারিও ডওসন, ইভান র্যাচেল উড-সহ আরও অনেকে। এই তালিকা শুধু হলিউডে না, সারা পৃথিবীর নির্যাতিত নারীদের একটা কমন প্লাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাদ যায়নি বলিউডও। বাদ যায়নি কর্পোরেইট রানি হয়ে থাকা অনেক পরিচিত/অপরিচিত মুখও। সবার তো আর টুইটারে একাউন্ট নেই। কিন্তু, খুব সহজেই ধারণা করা যায় এর পরিধি কত বিশাল।

অন্যদিকে কেবল হার্ভে উইনস্টেইন এককভাবে নিজেই যে পরিমাণ নারীদের যৌন নির্যাতন করেছেন তার তালিকাটা বেশ লম্বা।[২৮] এই তালিকায় বাদ যাননি এঞ্জেলিনা জোলি, সালমা হায়েকের মতো নামকরা অভিনেত্রীরাও।

এভাবে কি ভেবে দেখেছিলেন?

মজার ব্যাপার হলো, এখানে সকল অভিনেত্রী এতদিন কিন্তু মুখ বুজে ছিলেন। তাদের অনেকের ক্যারিয়ারে বেশ ভালো একটা জায়গায় এসে এখন সবাই মুখ খুলছেন। তাও মানুষের কাছে একটু আলোচনায় আসা এবং সহানুভূতি পাওয়ার আশায়। তাদের নিয়ে হয়তো মানুষ গুগলে সার্চ করবে। তাদের ছবি বা গান শুনবে। সে যাক, অন্য এক আলোচনা। যদিও তাদের কেউ বাধ্য করেনি যে, নিজের সতীত্ব বিকিয়ে দিয়ে হলেও মিডিয়ায় কাজ করে যেতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আরও অনেকেই হয়তো আছেন যারা এখনো মুখ খোলেননি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তারাও গোপন তথ্য ফাঁস করবে এবং অবশ্যই তা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরে।

চল যাই আমেরিকা!

কেবল মিডিয়াতেই যে মেয়েরা নিগ্রহের শিকার তা নয়। Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) নামের এই এজেন্সিটি আমেরিকার সরকারি প্রতিষ্ঠান। তারা মূলত কাজ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব নারী যৌন নিগ্রহের শিকার হয় তাদের রিপোর্টগুলো যাচাই বাছাই করার কাজে। সবাই যে স্বশরীরে এসে সেখানে রিপোর্ট করে যায়, তাও আবার না। তাদের ধারণা, প্রায় ৭৫% ঘটনাই রিপোর্টে আসে না। ২০১৫ সালে তারা প্রায় ৩০ হাজারের মতো রিপোর্ট হাতে পেয়েছিল। ২০১৬ তে এসে তারা বিষদ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে।[২৯] এই রিপোর্টে

---

[২৮] https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/10/harvey-weinstein-accusers-sexual-harassment-assault-rose-mcgowan-ashley-judd-gwyneth-paltrow (সতর্কতা: বেপর্দা নারীর ছবি আছে)

[২৯] https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976?lang=en (সতর্কতা:

তারা বলে, কর্মক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ২৫ থেকে ৮৫ ভাগ পর্যন্ত যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তাদের সহকর্মীদের মাধ্যমে। ২০০৩ এ EEOC এর আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, যৌন নির্যাতনের শিকার মহিলারা যদি তাদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলে তাহলে তাদের প্রায় আনুমানিক ৭৫%-ই পরবর্তীতে প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণের শিকার হন। এখন আপনিই বলুন, এত ঝামেলার ভেতর গিয়ে কয়জন মহিলা আছেন যারা মুখ খুলছেন?

এবার ঘরের মানুষ ঘরে (দেশে) ফিরে আসুন!

এতক্ষণ যা পড়লেন সব কিন্তু আমাদের 'স্বপ্নের আমেরিকার' কথা বলেছি। তাহলে ভাবুন বাংলাদেশের মতো দেশে অবস্থা আরও কত ভয়াবহ। ভাবুন আমাদের পাশের দেশ ভারতে অবস্থা কেমন? যেখানে প্রতিদিন লাখ লাখ মেয়ে ট্রেনে করে এক শহর থেকে আরেক শহরে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে অফিসের উদ্দেশে ভ্রমণ করছে। বাস, ট্রেনে কী পরিমাণ অশালীন হয়রানীর শিকার হচ্ছে! এখন আপনি বলুন, প্রতিদিন যদি এগুলো জরিপ হয়, তবে কয়জন মেয়ে পাচ্ছেন যারা এ নোংরা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যায় না। এগুলো নিয়ে খুব একটা জরিপ হয়ও না।

তবে যারা বাস্তবে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আছেন তারা জানেন আমাদের পোশাক শিল্পের খাত অর্থাৎ গার্মেন্টসে মেয়েদের সাথে কেমন খারাপ করে থাকেন সেখানকার সুপারভাইজার থেকে শুরু করে প্রতিটা মানুষ। ব্যতিক্রম হয়তো অল্প আছে। তবে তা ধর্তব্য নয়।

এইবার কিছু সংখ্যার খেলা দেখব। আসুন, আমার সাথে।

আইনগত সহায়তা দেয় এবং মানবাধিকারের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করে এমন একটি সংস্থা হলো 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র।' তাদের ২০১৬ এবং ২০১৭ এর দুইটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৬ তে ১৫৬ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।[৩০] ২০১৭ তে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০ জনে এসে ঠেকেছে।[৩১] আমরা চারপাশ দেখেই বুঝি আসল ঘটনার ১০০ ভাগের ১ ভাগও হয়তো এই রিপোর্টগুলোতে উঠে আসে না।

বেপর্দা নারীর ছবি আছে)

[৩০] http://www.askbd.org/ask/2017/01/08/sexual-harassment-january-december-2016/

[৩১] http://www.askbd.org/ask/2018/01/17/violence-women-sexual-harassment-january-december-2017/

অনেক কথা হলো, কিন্তু আসল কথাই যে বলা হলো না!

আমরা ওপরে এতক্ষণ যা পড়লাম তা হলো নারীবাদের অনেকগুলো প্রভাবের মধ্যে একটি। সহজভাবে বলি? মনে করুন, একটি গাছ লাগিয়েছেন যত্ন করে। তাতে প্রতিদিন পানি দিচ্ছেন, সার দিচ্ছেন। গাছ তো একসময় ফল দিবেই। কর্মক্ষেত্রে নারীর হেনস্তা হলো সেই গাছেরই অনেকগুলো ফলের মধ্যে একটি ফল। আর যেই গাছের গল্প এতক্ষণ করে আসছি তা হলো 'নারীবাদ'। নারীবাদ? কারা তৈরি করেছিল এ ধারণাটা? নারীবাদের ধারণাটা মূলত ফ্রান্সে প্রথম পরিচিতি লাভ করে। তখন অবশ্য মূল লক্ষ্য ছিল, নারীদের ভোটাধিকার পাওয়ার ব্যাপারে। তবে ১৮৯০ তে যুক্তরাজ্যে এবং ১৯১০ এ যুক্তরাষ্ট্রে এ ধারণা চালু হয়।

বিংশ শতাব্দীর একদম শুরুর দিকে আমেরিকার মেয়েরা যেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল তার মধ্যে কয়েকটা হলো ভোটাধিকার না থাকা। কোনো প্রকার সম্পত্তির ওপর অধিকার দাবি করতে পারত না, কোনো প্রকার আইনি কাগজে সাক্ষ্য দিতে পারত না তারা ইত্যাদি। তখন মূলত এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।

কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

কালের বিবর্তনে বর্তমানের নারীবাদীদের লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে—যেমন আর্থ-সামাজিক, আইন কাঠামো ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে—তাদের আধিপত্য বিস্তার করা। তারা যদিও বলতে চায়, নারীবাদের মূল লক্ষ্য হলো নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমতায়ন নিশ্চিত করা; তথাপি তাদের অধিকাংশ কার্যকলাপে যেটি পরিলক্ষিত হয় তা হলো স্রেফ পুরুষদের অনুকরণ এবং অনুসরণ করা। অর্থাৎ, একজন পুরুষ যেহেতু একটি কাজ করছে আমাকেও ঠিক সেই কাজটিই করতে হবে—এমন একটি মনোভাব ধারণ করা।

অত কঠিন কথা বুঝি না। সহজ করে বলি। মনে করুন, একজন ছাত্র প্রতি পরীক্ষাতেই ফলাফল খারাপ করছে। বাসা থেকে এবার বলে দিয়েছে—পরের পরীক্ষা খারাপ করলে একদম সোজা ঘাড় ধরে বাসা থেকে বের করে দেবে। তো, ছাত্রটি এখন কী করবে? নিশ্চয়ই চাইবে পরীক্ষায় ভালো করতে। সেজন্য কাউকে না কাউকে তো অনুসরণ করা লাগবে। আর অনুসরণ যেহেতু করা লাগবেই, সেহেতু নিশ্চয়ই সে ক্লাসের ফার্স্ট বয়কেই অনুসরণ করবে। সেই ফার্স্ট বয় যেভাবে পড়ে, যেভাবে কথা বলে, যেভাবে হাসে, যেভাবে যা কিছু করে সে চাইবে তার খুব ভালোমতো অনুকরণ করতে।

আমাদের নারীবাদীদের অবস্থা হয়ে গিয়েছে অনেকটা সেরকম। তাদের কাছে 'উন্নতি' শব্দটা মানেই হয়ে গিয়েছে পুরুষের অনুকরণ (একদম অন্ধ অনুকরণ)। একজন পুরুষকে সে বসিয়ে নিয়েছে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে, যার সাপেক্ষে একজন নারী তার উন্নতি হলো কি হলো না তা পরিমাপ করবে। কী হাস্যকর, তাই না? অথচ একজন পুরুষ কখনোই বলে না, একজন নারী সন্তান জন্ম দিচ্ছে, আমিও সন্তান জন্ম দেব। একজন নারী শাড়ি পরছে, আমিও তাই করব।

এই সম-অধিকারের নামে পুরুষের সমকক্ষ হতে চাওয়ার যে চিরায়ত অভিলাষ নারীবাদীদের ছিল, তার সামান্য নমুনা আমি প্রথমেই কিছু পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীকে বাড়ির বাহিরে এনে জনসম্মুখে লাঞ্ছিত করা হয়েছে বারংবার। এর পরিসংখ্যান এত অধিক পরিমাণ যে, লিখতে গেলে কেবল এই লেখার কলেবরই বাড়বে না; বরং কয়েক খণ্ড পাণ্ডুলিপি লিখেও শেষ করা যাবে না। অনলাইনে কেবল উন্নত দেশগুলোর বর্তমান অবস্থার ওপর ভিত্তি করে যে পরিমাণ নারী নির্যাতনের প্রতিবেদন জমা হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তা পড়ে শেষ করা যাবে না। তাহলে অনুন্নত দেশগুলো যেখানে নানা বিদেশি এনজিও নারী উন্নয়নের চেতনাকে সামনে রেখে আমাদের মা-বোনদের বাহিরে এনে ছেড়ে দিচ্ছেন, তাদের ওপর কী পরিমাণ নির্যাতন হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

তবে, কথা আছে!

এক্ষণে এসে একজন শাইখের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'দেখবেন সমস্ত NGO-দের সাইনবোর্ড হলো "নারীবান্ধব"। তারা বলে নারীর অধিকার—সমান অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর আবার ক্ষমতায়ন কী! আল্লাহ তো নারীকে সমান অধিকার দেননি। আল্লাহ নারীকে 'অগ্রাধিকার' দিয়েছেন। এরা মায়ের জাতি। এদের মাধ্যমে আমরা দুনিয়াতে এসেছি। সুতরাং এরা কেন সমানাধিকার পাবে? এরা কেন রিক্সা চালাবে, এরা কেন ভ্যান চালাবে? এরা কেন মাটি কাটবে? এরা এয়ার কন্ডিশানের ভেতর বসে খাবে।'

'নারীবাদ' এই শব্দের সাথে পরিচিত নয় আমাদের অধিকাংশই বাঙালি মেয়েরা। যারা পরিচিত তাদের অধিকাংশই সুযোগ পেয়েছেন দেশের খুব প্রথিতযশা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করার। নারীবাদী নারীদের খুব কট্টর একটা পর্যায় হলো, একটা সময় গিয়ে পুরুষ প্রজাতির সকলের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করা। এদের মধ্যে আবার দুইটা প্রধান ভাগ দেখা যায়। যেমন- একটি গ্রুপ হয়তো সমকামিতার দিকে পা বাড়ায় (অর্থাৎ লেসবিয়ান হয়ে LGBTQ movement এর সক্রিয় সদস্য হয়ে যায়)। আরেকটি গ্রুপ বৈধ পন্থায় বিয়ে করেন না ঠিকই, তবে একই সাথে একাধিক

পুরুষের সাথে রাত্রিযাপন করেন। কারণ, জৈবিক চাহিদা হলো প্রবল বন্যার সময় উজান থেকে যেয়ে আসা স্রোতের মতো। আপনি যদি বিয়ের মাধ্যমে এতে বাঁধ দিতে পারেন, তবে সঠিক পথে যাবে। কিন্তু নারীবাদীদের মধ্যে যারা কট্টরতার দিকে চলে যান, ধর্মের কোনো পরোয়া করেন না, তাদের কাছে বিয়ে করা এবং না-করা উভয়ই সমান দৃষ্টিতে পরিগ্রহ হয়।

সবই বুঝলাম! কিন্তু এই বঙ্গে কীভাবে এল নারীবাদ?

বাংলার মাটিতে সর্বপ্রথম নারীবাদের বীজ বপন করেন সরলা দেবী চৌধুরানী। তিনি ১৯১০ সালে সর্বভারতীয় নারী সংগঠন 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' স্থাপন করেন। তবে আমরা আমাদের দেশের সাপেক্ষে যদি একদম আদি ও অকৃত্রিম নারীবাদীরূপে কাউকে কল্পনা করি, তার নাম হলো বেগম রোকেয়া। তাকে অনেকেই বলেন বাংলার প্রথম প্রকৃত নারীবাদী নারী। সেই বীজ থেকে ডালপালা ছড়িয়ে আজ বিশাল এক মহীরূহ!

বেগম রোকেয়া! এই ছিল তবে আপনার মনে?

আমরা এই পর্যায়ে বেগম রোকেয়ার রচনা থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা দেখব, যেখানে তিনি নারীবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এবং সজ্ঞানে ধর্ম, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি শব্দে কেমন বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন।

১. পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনকেই তিনি মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখেছেন।

> 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব।'[৩২]

২. পর্দা প্রথা নিয়ে তার অভিমত

> 'গোটা ভারতবর্ষে কুল বালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়ে মানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ট আত্মীয়া এবং বাড়ীর চাকরাণী ব্যতীত অপর কোনো স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না। বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী পর্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশী শরীফ। শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারী মেমদের দেখিলে ছুটাছুটী

---

[৩২] স্ত্রীজাতির অবনতি, মতিচূর (প্রথম খণ্ড), পৃষ্ঠা ২১।

করিয়া পলায়ন করেন। মেম ত মেম- সাড়ী পরিহিতা খ্রীষ্টান বা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিলেও তাহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।'[৩৩]

আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন এভাবে,

> 'যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ যাহা মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'[৩৪]

কেবল সমস্যার কথাই বলবেন? এ পথের শেষ কোথায়?

আপনি যখন নিজেকে একজন মুসলিম কিংবা মুসলিমাহ হিসেবে পরিচয় দিবেন তখন আপনার সকল সমস্যার আশা ভরসার স্থল হওয়া উচিৎ কুরআন এবং সুন্নাহ। অনেকে অনেক কথাই বলবে। আজ নারীবাদের একটি রূপ আমরা দেখছি। আরও পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো নারীবাদের আরও কঠোর রূপ আমরা দেখব। কিন্তু ইসলাম কিছু নির্দিষ্ট সমাধান দিয়ে রেখেছে আগেই। এখন দেখতে চাই তারই কিছু নমুনা।

১. প্রথমেই যেই ব্যাপারটা নিয়ে বলতে চাই তা হলো, You Only Live Once (YOLO) এর ধারণা নিয়ে। অনেক মানুষ এই ধারণা করে থাকেন যে, জীবন একটাই। যা হবে এখানেই হবে, পরকাল বলে কিছু নেই। তাদের জন্য আর কিছু বলার নেই।

   তবে একজন মুমিন নারীর জন্য চূড়ান্ত লক্ষ কী? ঠিক ধরেছেন। জান্নাত। দুনিয়ার জীবনে সব দিন সমান ভালো যায় না। কিন্তু, একজন নারী মুসলিম হিসেবে অবশ্যই চাইবে তার পরকাল ভালো কাটুক।

   আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

   > 'যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমাদান মাসে সিয়াম রাখে, স্বীয় লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে, কিয়ামাতের দিন তাকে বলা হবে যে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তুমি প্রবেশ করো।'[৩৫]

---

[৩৩] আবদুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী, অবরোধ-বাসিনী, পৃষ্ঠা ৩৭৫।

[৩৪] "আমাদের অবনতি" - বেগম রোকেয়া। নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯০৪। কলকাতা। পৃষ্ঠা ২১৬-২১৮।

[৩৫] ইবনু হিব্বান, ৪১৬৩; মুসনাদু আহমাদ, ১৬৬১।

লক্ষ করুন, এখানে কিন্তু কোথাও বলা হয় নি নারীকে জান্নাতে যেতে হলে পুরুষের সাথে একই কাতারে এসে কাজ করতে হবে। বরং আল্লাহ্ কার কি কাজ সেটা আগেই বলে দিয়েছেন। নারীর জান্নাতে যাওয়ার কাজগুলো মূলত তার সালাতের প্রতি যত্নশীল হওয়া, নিজের ইজ্জত হিফাজত করে চলা, স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা ইত্যাদির ভেতরেই।

২. একজন মুসলিম পুরুষ সবার কাছে ভালো মানুষের তকমা পেতেই পারেন। তবে আল্লাহ কোনটা গ্রহন করবেন? যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী তার স্বামীকে উত্তম বলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> 'পূর্ণ মুমিন সেই যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।'[৩৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

> 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর থেকে ওয়াদাস্বরূপ নিয়েছ, আর তাদের সাথে সহবাস হালাল হয়েছে আল্লাহর কালাম দ্বারাই।'[৩৭]

৩. সর্বশ্রেষ্ঠ চার জান্নাতি নারী হলেন-

- খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ ﵁,
- ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ ﵁,
- মারইয়াম বিনতু ইমরান ﵁(ঈসা ﵇-এর মা) এবং
- আসিয়া বিনতু মুযাহিম ﵁(ফিরআউনের স্ত্রী)।[৩৮]

এদের মধ্যে প্রথমজন অর্থাৎ খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ ﵁-কে নিয়ে অনেক নারীবাদী বলে থাকেন যে, তিনি তো একজন ধনী মহিলা ছিলেন। অনেক টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়েছিলেন। অথচ তারা এটা ভুলে যায় যে, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর তালিকায় সমাসীন করার জন্যে এর কোনোটাই মানদণ্ড হিসেবে নেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বিয়ের পরই তাঁর সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীকে। ইসলামের প্রথম দিকের খুব কঠিন সময়গুলোতে এই মমতাময়ী স্ত্রী-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্নিধ্য দিয়েছেন, মানসিকভাবে সাহস

[৩৬] তিরমিযি, ১১৬২; মিশকাত, ৩২৬৪।
[৩৭] মুসলিম, ১২১৮; বাইহাকি, ৮৮৪৯।
[৩৮] তাবারি, ১১/৪১৫; সিলসিলা সহীহাহ, ১৫০৮।

যুগিয়েছেন। যার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই খাদীজা ﵂-এর ইন্তেকালের পরেও। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা স্মরণ করতেন। এই স্মরণ কোনো পার্থিব টাকার জন্য নয়, ফলের বিশাল বাগান, উট, খেজুরের গাছের জন্য ছিল না।

৪. কন্যাসন্তান একজন পিতামাতার জন্যে রহমতস্বরূপ। জান্নাতে যাওয়ার খুব উত্তম একটি মাধ্যম হতে পারে কন্যাসন্তান, যদি তাকে সঠিকভাবে দ্বীনি শিক্ষার ওপরে লালন করতে পারেন এবং দ্বীনদার পাত্রের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'কোনো ব্যক্তি যদি কন্যার দায়িত্বশীল হয়, এরপর তার প্রতি সুন্দর আচরণ করে; তাহলে এই কন্যারা তাকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে রাখবে।'[৩৯]

আবূ সায়ীদ খুদরী ﵁ থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে আছে; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি তিনটি মেয়েকে, (অন্য রিওয়ায়েতে আছে) অথবা দুটি মেয়েকে লালন-পালন করে তাদেরকে আদব শিক্ষা দেয়, বিবাহের ব্যবস্থা করে এবং তাদের প্রতি সুন্দর আচরণ করে, সে জান্নাতের অধিকারী হবে।'[৪০]

এই মর্মের হাদীস আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄-ও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ের লালন-পালন করে, তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের প্রতি সুন্দর আচরণ করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।'

(এ কথা শোনার পর) একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে আরজ করল, 'দুজন মেয়েকে লালন-পালন করলে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, দুজনকে লালন-পালন করলেও। (উপস্থিত সাহাবিদের ধারণা) সে যদি একজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত তাহলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হ্যাঁ' বলতেন।[৪১]

৫. নারীর অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী অনেক তরুণী আজ নানা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বাহিরে আসছে। কাজের খাতিরে হোক কিংবা নিজের প্রবৃত্তি মেটাতেই হোক—স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। এর অধিকাংশই আবার শারীরিক সম্পর্কে গড়াচ্ছে। আমাদের দেশের সুশীল সমাজ একে তেমন একটি খারাপ চোখে দেখেন না। অসাবধানতায় অনেক সময় যখন

---

[৩৯] বুখারি, ১৪১৮, ৫৯৯৫।
[৪০] সুনানু আবী দাউদ, ৫১৪৭।
[৪১] মুসনাদু আবী ইয়ালা, ২৪৫৭।

গর্ভধারণের সময় চলে আসে, তখন সেসব সুশীল পুরুষদের আর দেখা যায় না। যার ফলাফল আমরা দেখতে পাই ডাস্টবিনে আবর্জনার সাথে ফেলে রাখা নবজাতকের লাশ কিংবা ভ্রূণ থাকা অবস্থাতাতেই শিশুকে হত্যা করে ফেলা। আইয়ামে জাহিলিয়াতের সময় দেখা যেত, মানুষ কন্যাশিশুকে অভাবের ভয়ে মেরে ফেলত। আর বর্তমানে নারীবাদী পুরুষ বা নারী কারও মুখে এই অবাধ স্বাধীনতার ফসল এই নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোর ব্যাপারে কিছুই শোনা যায় না।

হাসনা বিনতু মুয়াবিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমাকে আমার চাচা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছি যে, কোন ধরনের লোকেরা জান্নাতি হবে? তিনি বললেন, শহীদরা জান্নাতি। মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু জান্নাতি। (জাহিলিয়াতের যুগে) জীবন্ত প্রোথিত শিশু জান্নাতি।[৪২]

৬. মায়ের মর্যাদার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত বুখারি এবং মুসলিমের হাদীস তো আমাদের জানাই আছে।

> আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’; সে বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’; সে আবারও বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। সে পুনরায় বলল, ‘এরপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার পিতা।’[৪৩]

৭. নারীবাদীদের সবচেয়ে বড় আরেকটি অভিযোগ হলো, ইসলামে মেয়েকে তার প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। একজন বোন তার ভাইয়ের তুলনায় সম্পদ কম পায়, অর্ধেক পায়। মনে করুন, একজন কন্যা তার পিতার কাছ থেকে অর্ধেক সম্পত্তি পেল। এরপর সেই কন্যার বিয়ে হলো। তার ভরণপোষণসহ যাবতীয় খরচের দায়ভার কার? তার স্বামীর। স্বামীর কাছ থেকেও সে সম্পত্তির কিছু অংশ পাবে। এভাবে তার সম্পত্তি হিসাব করতে গেলে তার সেই ভাইয়ের চেয়েও বেশি হয়ে গেল। আর তার ভরণপোষণসহ যাবতীয় খরচ পুরুষ সদস্যের থাকার কারণে নারীর অতিরিক্ত কোনো খরচও করতে হচ্ছে না তার পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে। স্বামী না থাকলে তার দেখভাল করবে তার পুত্রসন্তান। তারাও না থাকলে তার দেখভাল করবে নারীর ভাই বা বাবা। অর্থাৎ, এখানে লক্ষণীয় যে, নারী সবসময় কোনো-না-কোনো পুরুষ সদস্যের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় থাকছে।

[৪২] সুনানু আবী দাউদ, ২/২২০০, *কিতাবুল জিহাদ* অধ্যায়।
[৪৩] মুসতাদরাক আলা সহীহাইনি, ৪/২৬০।

কুরআনের আলোকে নারীর অধিকার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে নিচে দেওয়া টীকাতে।[৪৪]

আইয়ামে জাহিলিয়াতের সময়টায় নারীদের কোনো সম্পত্তিই যেখানে দেওয়া হতো না, ইসলাম প্রথমবারের মতো নারীদের সম্পত্তি বণ্টনের কথা এনেছে। পবিত্র কুরআনে তা একদম স্পষ্ট।

> 'মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরা যে ধনসম্পত্তি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর মেয়েদের অংশ রয়েছে সেই ধনসম্পত্তিতে, যা মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, তা সামান্য হোক বা বেশি এবং এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।'[৪৫]

৮. ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে বলে 'সূরা নিসা' নামে সম্পূর্ণ একটি সূরা নাযিল করেছেন আল্লাহ। এছাড়াও কুরআনে নানা স্থানে নারীর প্রতি মমতা দিয়ে আল্লাহ পুরুষদের অনেক আদেশ দিয়েছেন। দেখে নেওয়া যাক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আয়াত।

> 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরকম বাসগৃহে থাকো, তাদেরকেও (ইদ্দতকালে) সেখানে থাকতে দাও। তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য উত্যক্ত কোরো না। আর তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব না-হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করো। তারপর তারা যদি তোমাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করায়, তাহলে তাদেরকে তার বিনিময় দাও এবং (বিনিময়দানের বিষয়টি) তোমাদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উত্তমপন্থায় ঠিক করে নাও। কিন্তু (বিনিময় ঠিক করতে গিয়ে) তোমরা যদি একে অপরকে কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চেয়ে থাকো, তাহলে অন্য নারী বাচ্চাকে দুধ পান করাবে।'[৪৬]

আমাদের সমাজে আরেকটি খারাপ দিক দেখা যায় নারীর বিবাহের সময়। একজন নারীকে পছন্দমতো দেনমোহর নির্ধারণ করার স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু, এখানে অনেকটা সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে পাত্রীর বাবা-মা খুব বড় অংকের একটি মোহর নির্ধারণ করেন। পাত্রপক্ষও তাতে সম্মতি দেয়। তবে উভয়পক্ষই জানেন যে, আদতে বরপক্ষ এই মোহর পরিশোধ করবে না। অথচ এটি স্ত্রীর অধিকার।[৪৭] স্ত্রী স্বেচ্ছায় ক্ষমা করে দিলে সেটা ভিন্ন কথা।

---

[৪৪] http://www.alkawsar.com/article/406

[৪৫] সূরা নিসা, ৪ : ৭।

[৪৬] সূরা তালাক, ৬৫ : ৬।

[৪৭] https://islamqa.info/en/2378

তবে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রেও তাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করা হয়। বাসররাতে এমন একটা সময় স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়, যখন স্ত্রী নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরে ক্ষমা করতে বাধ্য হন। নচেৎ সমাজে নতুন স্ত্রী নিয়ে আরও দশ কথা বের হবে। তবে এটা ঠিক যে, স্ত্রী যদি নিজেই স্বামীর প্রতি ইহসান করে ধার্যকৃত মোহর আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়, সেজন্য স্ত্রী অবশ্যই আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদানের আশা করতে পারে শেষ বিচারের দিন। কুরআনে এসব ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা রাখা হয়নি। আল্লাহ কুরআনে কী বলেছেন দেখুন-

> ‘আর আনন্দের সাথে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে তা ভোগ করতে পারো।’[৪৮]

আরেকটি ব্যাপার হলো, কোনো বৈধ কারণে যদি তালাকের সিদ্ধান্ত হয়েই যায়, তবে স্বামীর পক্ষে এটাও উচিৎ নয় যে, তার প্রাক্তন স্ত্রীকে দেওয়া মোহর ফেরত নেবে।

> ‘আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তুপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে? আর তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে, যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।’[৪৯]

আল্লাহ এখানে নারীকে নিজের অবস্থান ধরে রাখার ব্যাপারে যে সাহস দিয়েছেন, আমাদের বেগম রোকেয়ার অনুসারী নারীবাদী নারী কিংবা পুরুষরা এটি কখনো তুলে ধরেন না ইচ্ছাকৃতভাবে। কারণ, বিয়ের এই সুন্দর দিক তুলে ধরলে বন্ধ হয়ে যাবে তাদের লিভ টুগেদারের ক্রমবর্ধমান এবং জনপ্রিয় ব্যাবসা এবং ভ্যালেন্টাইন্স ডে’র রাজনীতি।

আল্লাহ আমাদের নারীবাদের ধ্বংসাত্মক দিক থেকে নিজেদের এবং আমাদের পরের প্রজন্মকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

---

[৪৮] সূরা নিসা, ৪ : ৪।
[৪৯] সূরা নিসা, ৪ : ২০-২১।

নাস্তিকতা, তর্ক, যুক্তি

আসিফ আদনান

১২৪ হিজরির ঈদুল আযহার দিনে কুফার অধিবাসীরা বিচিত্র এক ঘটনার সাক্ষী হয়। কুফায় বানু উমাইয়্যার নিয়োগকৃত প্রতিনিধি, খালিদ ইবনু আবদিল্লাহ আল কাসরী ঈদের খুতবায় ঘোষণা করেন—

> 'হে লোক সকল, আপনারা কুরবানি করুন। মহান আল্লাহ আপনাদের কুরবানি কবুল করে নিবেন। আমি জা'দ ইবনু দিরহামকে কুরবানি করছি। সে মনে করে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে খলীলরূপে গ্রহণ করেননি এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথাও বলেননি। অথচ জা'দ যা বলছে মহান আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।'

তিনি জা'দ ইবনু দিরহামকে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৫০]

জা'দ ইবনু দিরহামের ব্যাপারে ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের[৫১] সারমর্ম হলো :

জা'দ ইবনু দিরহাম হলো প্রথম ব্যক্তি যে দাবি করেছিল, কুরআন সৃষ্ট। পরবর্তীতে মুতাযিলাদের মাধ্যমে এই কুফরি আকীদা প্রসার পায়। জা'দের কাছ থেকে এই আকীদা গ্রহণ করে জাহমিয়্যাহ ফিরকার সূচনাকারী জাহম বিন সাফওয়ান। জাহম বিন সাফওয়ানের কাছ থেকে এই আকীদা গ্রহণ করে বিশর আল মুরাইসি। আর বিশর আল মুরাইসির কাছ থেকে গ্রহণ করে আহমাদ ইবনু আবি দুআদ।

জা'দ ইবনু দিরহামের আকীদাকে জনপ্রিয় করে জাহম বিন সাফওয়ান। এবং জাহম বিন সাফওয়ানের প্রচারিত আকীদার বিভিন্ন দিক বিভিন্নভাবে মুতাযিলা-সহ ভ্রান্ত

[৫০] খালকে আফআলিল ইবাদ, ২৯; মুখতাসিরুল উলু, ৭৫।
[৫১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/১৪৮।

আকীদার নানা ফিরকার উত্থানে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পবিত্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ভ্রান্তির শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় জাহম বিন সাফওয়ানের কাছে।

জাহম বিন সাফওয়ানের এ বিষাক্ত আকীদা কীভাবে গড়ে উঠেছিল? কোন চিন্তা পদ্ধতির মাধ্যমে সে হাজার বছর ধরে উম্মাহকে তাড়া করে বেড়ানো এ ভ্রান্ত উপসংহারগুলোতে পৌঁছেছিল?

জাহমের পথভ্রষ্টতার শুরুটা হয়েছিল নাস্তিকদের সাথে তর্ক থেকে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারি-সহ অন্যান্য আরও অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী, সুমানিয়্যাহ নামের একদল দার্শনিকদের সাথে ইসলামের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক শুরু করে। সুমানিয়্যাহরা ছিল ভারত ও খুরাসানের দিকের একটা ফিরকা, যারা বিশ্বাসের দিক থেকে naturalist (প্রকৃতিবাদী/প্রাকৃতদার্শনিক) ছিল।

সুমানিয়্যাহদের সাথে জাহমের তর্কের ভিত্তি ছিল কালাম।[৫২] রেটোরিক, লজিক। এ ধরনের তর্কের একটা উদাহরণ দেখা যাক। সুমানিয়্যাহরা জাহমকে প্রশ্ন করল—

তুমি দাবি করো, ইলাহ আছে?
- হ্যাঁ।
তুমি কি সরাসরি তোমার ইলাহকে দেখেছ?
- না।
তাঁর কথা শুনেছ?
- না।
কোনো ঘ্রাণ পেয়েছ?
- না।
কখনো তাঁকে স্পর্শ করেছ?
- না।
কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছ?
- না।
তার মানে তুমি আসলে জানো না যে, সে ইলাহ?
- ...
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যাকে অনুভব করা যায় না, তার কি আসলেই অস্তিত্ব আছে?

জাহম কোনো জবাব দিতে পারল না। এ কথোপকথনের পর চল্লিশ দিন সে সালাত

[৫২] শারহু কিতাবুল ইবানাহ, ১৮।

আদায় করা থেকে বিরত থাকল। কারণ, সে বুঝতে পারছিল না সে আসলে কোন সত্তার ইবাদাত করছে। তারপর একটা যুতসই উত্তর খুঁজে বের করল। কিন্তু দেখা গেল এ উত্তরকে যুক্তির মাপকাঠিতে টিকিয়ে রাখতে হলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পবিত্র নাম ও গুণাবলীসমূহকে অস্বীকার করতে হচ্ছে। নিজের যুক্তির দার্শনিক ও যৌক্তিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য সে তাই করল। এভাবে সে কুরআন সৃষ্ট হবার বিশ্বাসও গ্রহণ করল, কিংবা বলা যায় করতে বাধ্য হলো।

পুরো ব্যাপারটার শুরু কোথা থেকে?

অনেক আলিমের মতে, জাহম বিন সাফওয়ানের ফিকহের ব্যাপারে জ্ঞান ছিল, এছাড়া ইলমুল কালামেও তার দক্ষতা ছিল। কিন্তু আকীদার মজবুত ভিত্তি, শারীয়াহর দলিল, দলিলের সঠিক ব্যাখ্যা এবং সালাফ আস-সালিহীনের আছারের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া নাস্তিকদের ঠিক করা কাঠামোর ভেতরে ঢুকে তাদের সাথে বিতর্কে যাবার কারণে সে নিজে বিভ্রান্ত হয়েছিল, এবং পরবর্তী যুগ যুগ ধরে তার এসব বিভ্রান্তি উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফিরকা ও ফিতনার জন্ম দিল, যার প্রভাব আজও চলছে। যতটুকু বোঝা যায়, জাহমের প্রাথমিক নিয়তও ভালো ছিল। তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সে ইসলামকে ডিফেন্ড করত, নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দিত। আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু মৌলিক কিছু ভুলের কারণে এ কাজটাই উম্মাহর জন্য মারাত্মক এক ফিতনা হয়ে দেখা দিল।

জাহমিয়্যাহ এবং মুতাযিলাদের সময়ে কাফিরদের সাথে তর্কের মূল বিষয় ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী ইত্যাদি নিয়ে। তাই এ বিতর্ক থেকে জন্ম নেয়া বিচ্যুতিগুলো ছিল মূলত আকীদার এ বিষয়গুলো নিয়ে। আমাদের সময়েও নাস্তিকদের সাথে অনেক তর্ক হয়। বেশ ক'বছর যারা ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করেন তাদের কাছে এটা কাজের বেশ জনপ্রিয় একটা দিকও। আমাদের সময়ের নাস্তিকরাও আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, 'স্রষ্টা এমন না হয়ে অমন না কেন?'– এ ধরনের প্রশ্নও করে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমাদের সময়ে কাফিরদের দ্বন্দ্বের মূল বিষয় আল্লাহর অস্তিত্ব না।

'আল্লাহ আছেন'—অ্যামেরিকা বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, চায়না বলেন, ইউএন বলেন—বৈশ্বিক কুফর-ব্যবস্থা এ বিশ্বাস মেনে নিতে রাজি আছে। কিন্তু আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে জীবন চালাতে হবে, সমাজ চালাতে হবে, শাসন চালাতে হবে—এটা মেনে নিতে তারা রাজি না। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামি শারীয়াহ যেসব বিধিবিধান ঠিক করে দেয়, বুঝে-না-বুঝে ভোগবাদের অনুসরণে ব্যস্ত আজকের পৃথিবী সেটা মানতে রাজি না। সামাজিক আচার-আচরণ ইসলামি শারীয়াহ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে, সংস্কৃতি কিংবা ট্র্যাডিশানের ভিত্তিতে না—আজকের সমাজ

এটা মানতে নারাজ। মুসলিমদের সমাজ-ই এটা মানতে চায় না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন দিয়েই শাসন করতে হবে—এ কথাটা কারও পক্ষে আজ মেনে নেয়া সম্ভব না।

তাই আজ দ্বন্দ্বটা 'আল্লাহ আছেন কি না?' সেই প্রশ্ন নিয়ে না। দ্বন্দ্ব হলো 'আল্লাহর শাসনের সীমানা কতদূর?' তা নিয়ে।

আপনি দেখবেন, ইসলামের ঐ বিষয়গুলো নিয়ে কাফিররা সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে, যেগুলো বর্তমান ভোগবাদী, লিবারেল বিশ্বদর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। সেটা হতে পারে নিকাবের আদেশ, স্বামীর আনুগত্য, মহিলাদের ঘরে থাকা, মুরতাদ হত্যার বিধান, কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা, কুফর ও শিরকের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, জিহাদ, আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবমাননাকারীর শাস্তি ইত্যাদি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়টা হলো, প্রতিনিয়ত একটা সেক্যুলার ও পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরে থাকার কারণে, আমরা মোটামুটি সবাই কাফিরদের এ দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে মূল অবস্থান হিসেবে মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েছি কাফিরদের ঠিক করা মানবতা, শান্তি, অধিকার ইত্যাদির সংজ্ঞা ও কাঠামোগুলো। তারপর চেষ্টা করছি এ কাঠামোগুলোর ভেতরে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে খাপ খাওয়াতে। স্বাভাবিকভাবেই যখন পারছি না, তখন আমরা এ বিধানগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করছি।

পুরো ব্যাপারটার সাথে জাহম বিন সাফওয়ানদের অবস্থার অদ্ভুত মিল আছে। জাহমদের প্রথম ভুল ছিল, অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক মূলনীতিগুলোকে মেনে নিয়ে তর্কে ঢোকা। দ্বিতীয় ভুল ছিল, আকীদা, নুসুস ও আছার (text) এর শক্ত জ্ঞান ছাড়াই বিতর্ক করা। তাদের তৃতীয় ভুল ছিল, তর্কে আটকে যাবার পর সেই তর্ক ছেড়ে না দিয়ে তর্কে জেতার জন্য নিজেদের বানানো নতুন নতুন যুক্তি নিয়ে আসা। চতুর্থ ভুল ছিল, সালাফ আস-সালিহীনের অবস্থানের সাথে এসব যুক্তির অসামঞ্জস্য তাদের কাছে তুলে ধরার পর তাওবা না করে নিজেদের ভুলের উপর অটল থাকা। নিজের অহম, আত্মমর্যাদার ভ্রান্তিকর ধারণা, 'মানুষ কী বলবে?' ইত্যাদির কারণে ভুল স্বীকার না করা। আজ হুবহু এ ব্যাপারটাই হচ্ছে।

ইসলামের সঠিক বুঝ ছাড়াই আমরা ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি। সেটা করতে যাচ্ছি কাফিরদের মানবতা, অধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদিকে সঠিক ধরে নিয়ে। তারপর ইসলামকে মানবিক, আধুনিক, সহজ, শান্তিপ্রিয় প্রমাণের জন্য, কাফিরদের কাছে নিজেদের 'সভ্য' আর 'অ-সন্ত্রাসী' প্রমাণের জন্য এমনভাবে কুরআন ও হাদীসকে ব্যাখ্যা করছি, যেসব ব্যাখ্যা পুরোপুরি বাতিল। আর যখন ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া

হচ্ছে, তখন আমরা ভুল স্বীকার করছি না। বরং নিজেরা আবোল-তাবোল ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

দুটো পথ—প্রায় হুবহু এক। যদিও মাত্রার ভিন্নতা আছে। দেখুন, জাহমিয়্যাহ ও মুতাযিলাদের অনেকের প্রাথমিক নিয়ত ভালো ছিল; কিংবা বলা যায়, আন্তরিক ছিল। এটা আহলুস সুন্নাহর অনেকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আন্তরিক হওয়া এবং ভালো নিয়ত থাকা যথেষ্ট না। বিশেষ করে, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে। শারীয়াহর বিধান, হাদীসের বক্তব্য কিংবা কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করা কোনো "যেমন খুশি করো" প্রজেক্ট না, যেটা আমরা সবাই ইচ্ছেমতো করতে পারব। প্রায় প্রত্যেকটা বাতিল ফিরকা কোনো-না-কোনো আন্তরিক লোকের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। এ বিষয়গুলোর মধ্যে এমন অনেক অর্থ ও তাৎপর্যের এমন অনেক পর্যায় আছে, যার সবকিছু হয়তো আমাদের কাছে পরিষ্কার না। আল্লাহর সব হুকুমের পেছনের হিকমাহ আমরা জানব বা আমাদের জানাতে হবে—এমন কোনোকিছু ইসলাম বলে না। এবং এসব বিষয়ে সূক্ষ্ম কোনো ভুলও এক সময় ভয়ঙ্কর বিচ্যুতিতে পরিণত হতে পারে। কারণ, ইবলিস অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে আপনার-আমার চেয়ে অনেক আগানো। আমাদের দুর্বলতা কোথায়, আমাদের মনের অসুখগুলো কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, সেটা সে খুব ভালোভাবেই জানে।

কয়েকটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

১. আকীদা ও শারীয়াহর বিধিবিধানের ব্যাপারে বুঝ ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র সালাফ আস-সালিহীন ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমামগণের কাছ থেকে নেওয়া।

২. তর্কে জেতার চেয়ে আকীদা ও দ্বীন হিফাযত করা লক্ষ কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দেয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করা।

৩. ইসলামকে বুঝতে হবে দলিলের ভিত্তিতে। যুক্তি, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়ানুভূতি—সবকিছু ওহির অনুগামী হবে, উলটোটা না। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যা বলেছেন, তা-ই সঠিক। কোনো যুক্তি ছাড়া, কোনো প্রমাণ ছাড়া। যদি আমার চোখ, কান বা আকল (বুদ্ধি/যুক্তি) এক কথার সাক্ষ্য দেয়, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ উলটোটা বলেন, তাহলে আমার চোখ, আমার কান, আমার আকল মিথ্যা বলছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলছেন—এটা বিশ্বাস করতে হবে। আসলেই বিশ্বাস করতে হবে।

৪. ইসলামকে ‘দুনিয়াসম্মত’/দুনিয়া-কমপ্লায়েন্ট করা আমাদের কাজ না। আমাদের কাজ দুনিয়াকে ইসলাম অনুযায়ী বদলানোর চেষ্টা করা।

৫. আল্লাহর ব্যাপারে, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা না বলা। এটা অনেক মারাত্মক একটা গুনাহ। এবং এটা চরম বিপর্যয়ের পথ খুলে দেয়।

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

> ‘আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত, অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আর এটি সবচেয়ে গুরুতর নিষেধাজ্ঞাগুলোর অন্যতম।’

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ একে সর্বনিকৃষ্ট গুনাহের একটি হিসেবে গণ্য করেছেন।

> ‘আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।’[৭৩]

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

> ‘আল্লাহ আযযা ওয়া জাল গুনাহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ফেলেছেন। এই আয়াতে তিনি চার শ্রেণির গুনাহের কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন ফাওয়াহিশের (কবীরা গুনাহ, যেমন- যিনা ও ব্যভিচার) কথা, তারপর যুলুম, তারপর শিরক আর তারপর বলেছেন সর্বনিকৃষ্ট মাত্রার গুনাহর কথা—না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা, না জেনে তাঁর ব্যাপারে কিছু আরোপ করা। আল্লাহ শুরু করেছেন সবচেয়ে কম মাত্রার গুনাহ দিয়ে আর শেষ করেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্টমাত্রার গুনাহের কথা বলে।’

আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু সেটা নিজেদের বুঝ, খেয়ালখুশি, আবেগ কিংবা পছন্দ অনুযায়ী করলে হবে না। সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভেতরে থেকেই করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে বোঝার ও মানার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সমকামিতা কি আসলেই জেনেটিক?

ড. সাইফুর রহমান

নাস্তিক-মুক্তমনা এবং লিবারেল ঘরানার মানুষরা অনেক দিন থেকেই দাবি করে আসছে, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন শারীরিকভাবে আগে থেকেই নির্ধারিত, সহজাত এবং জন্মগত একটি বৈশিষ্ট্য। বাস্তবতা হলো, তাদের এই 'জন্মগতভাবে সমকামী' দাবির পক্ষে বৈজ্ঞানিক কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই; বরং গত কয়েক বছর আগে আমেরিকার জন হপকিন্সের দুই বিখ্যাত মনোবিদ প্রায় ২০০ বৈজ্ঞানিক জার্নাল ঘেটে নিউ অ্যাটলান্টিস নামক জার্নালে একটা প্রতিবেদন ছাপিয়েছেন, যেখানে তারা দেখিয়েছে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের সাথে সহজাত, জন্মগত বা বায়োলোজিক্যাল যে সম্পর্ক এতদিন ভাবা হতো তার বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। কিছু বায়োলজিক্যাল প্রভাবক আছে যার সাথে লৈঙ্গিক আচরণগত সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেটা কোনোমতেই ওরিয়েন্টেশনে ভূমিকা রাখে না।

অনেকেই নেচার নিউজের একটা লিংক শেয়ার করে থাকে, সেখানে না কি দাবি করা হয়েছে সমকামিতার সাথে জিনের সম্পর্ক রয়েছে। এরা অজ্ঞতা থেকে এসব জিনিসপত্র শেয়ার করে থাকে। প্রথমত, গবেষণাটি নেচার জার্নালে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ না, এটা একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে একজন বিজ্ঞানীর দেয়া গবেষণার আপডেট। বিষয়টা হলো, সেখানে দাবি করা হয়েছে, সমকামিতার সাথে সম্ভাব্য জিনগত সম্পর্কটা প্রচলিত ক্লাসিকাল জেনেটিক্সের মতো নয়। এর সাথে এপিজেনেটিক্স নামে জীববিজ্ঞানের নতুন একটি শাখার সম্পর্ক। সংক্ষেপে বলতে গেলে এপিজেনেটিক্স হলো, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর বা বাহ্যিক কোনো কারণে ক্রোমোসোমের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে ডিএনএ-এর গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না; কিন্তু জিনের কার্যবৃত্তি পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা জীবনের যেকোনো পর্যায়ে হতে পারে। এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তন প্রাত্যাহিক জীবনের

সাথে সম্পর্কিত অনেক কারণেও হতে পারে। যেমন : ড্রাগ, বিষাক্ত কেমিক্যাল, খ্যাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণে।

সমকামিতার সাথে এপিজেনেটিক্সের সম্পর্ক আছে কি নেই এটা বলার মতো অবস্থা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। তবে এখন আপনাদের মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া প্রমাণিত কিছু এপিজেনেটিক্সের ফলাফল উদাহরণসহ উল্লেখ করব।

১. **মাতৃপ্রভাব :** আমরা অনেকেই কথাটা জানি, মায়েদের স্বাস্থ্যের ওপরে গর্ভের সন্তানের সুস্থতা ও শারীরিক সক্ষমতা নির্ভর করে। এর মূল কারণটা অনেকেই জানে না যে, এটা এপিজেনেটিক্সের কারণে হয়ে থাকে। ইঁদুরের ওপরে এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাতৃত্বকালীন খ্যাদ্যাভ্যাস ও মানসিক অস্থিরতা জরায়ুর ভ্রূণের ওপর প্রভাব ফেলে। আমরা অনেকসময় বলি, গর্ভবতী মায়েদের ধুমপান অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, গর্ভকালীন ধুমপান ডিএনএ-এর এক্সপ্রেশনে প্রভাব ফেলে। এমনকি মাতৃত্বকালীন মানসিক ও সামাজিক আচরণের সাথে মানসিক চাও এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তন ঘটায়। ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মা ইঁদুরের অস্থিরতার কারণে নবজাতকের স্নায়বিক সমস্যা হয়েছে।

২. **পিতৃপ্রভাব :** শুধু মায়েদেরই নয়, বাবাদের স্বাস্থ্যের সাথেও সন্তানের সুস্থতা সম্পর্কিত। অতিরিক্ত এলকোহল পান করার কারণে যথাক্রমে শুক্রাণুর ডিএনএ-এর মিথাইলেশনে ও জার্মলাইনে প্রভাব পড়ে, যা একটি এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তন।

৩. **গর্ভকালীন প্রভাব :** অবাক করা তথ্য, সিজারের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুদের ডিএনএ-এর মিথাইলেশন সাধারণভাবে জন্ম নেয়া শিশুদের থেকে বেশি থাকে, যা এপিজেনেটিক্যাল। শিশুদের বেড়ে উঠার সময়ে বাবা-মায়ের যত্ন-আত্তি, সামাজিক আচরণ, মানসিক চাপ গ্রহণ ইত্যাদি পরবর্তীতে ডিএনএ-এর এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তনের মাধ্যমে বায়োলজিক্যাল মেমরি ও নিউরোন সার্কিট গঠনে ভূমিকা রাখে।

একইভাবে বয়ঃসন্ধিতে, সাবালকত্বে, অনেক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবক আছে যা মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে ভূমিকা রাখে। এ সবই এপিজেনেটিক্যাল ডিএনএ পরিবর্তনের ফলাফল।

আমরা জানতে পারলাম, যেসব পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবকগুলো ডিএনএ-এর কার্যক্রমে পরিবর্তন আনে, যাকে আমরা এপিজেনেটিক্স বলছি, তার সবগুলোই মানুষের 'চয়েস' বা ইচ্ছাকৃত। সমকামিতাও একটি 'চয়েস', যার ফলে পরবর্তীতে

এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তন হচ্ছে যদিও বিষয়টি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয়।

ওপরের বিষয়গুলো ছাড়াও এপিজেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর বায়োলজিক্যাল ফাংশন চেইঞ্জ করে এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা জেনেটিক অসুখগুলো (যেমন- রক্তশুন্যতা, সিস্টিক ফিব্রোসিস ইত্যাদি) ক্রোমোসোমজনিত পরিবর্তনের ফলে হয়ে থাকে। মায়ের থাকলে সন্তানের হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। এখানে মায়ের কিছুই করার থাকে না; কারণ এটা তার জিনের পরিবর্তনের ফল। পক্ষান্তরে, এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তনের জন্য মানুষের নিজস্ব কর্মকাণ্ড (ড্রাগ, এলকোহল, ধূমপান, মানসিক চাপ ইত্যাদি) দায়ী থাকে। সমকামিতার সাথে জিনের সম্পর্ক আছে দাবি করাটা ততটাই হাস্যকর যতটা হাস্যকর অতিরিক্ত মদপান, ধূমপান বা ড্রাগ আসক্তির জন্য জিন দায়ী দাবি করাটা।

আরও একটি তথ্য জানিয়ে লেখাটা শেষ করছি, গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে উঠা একজন মানুষের সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা শহরে বেড়ে উঠা কারও থেকে ন্যূনতম ৪ গুণ কম, যা প্রমাণ করে সমকামিতা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিধারার অনুগামী।

কওমে লূত ২.০: একটি ব্যবচ্ছেদ

মুহাম্মাদ মশিউর রহমান

খাতামুন নাবিয়্যিন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাত হওয়ার বরকতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো, পূর্ববর্তী নবি-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-দের করা আমল বা দুআগুলো একপ্রকার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে যাওয়া।

যেমন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার অনুতাপে আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)-এর করা ক্ষমাপ্রার্থনা,[৫৪]

বা সমুদ্রের গভীরে, মাছের পেটের ভেতরে থাকাবস্থায় ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর করা দুআ,[৫৫]

কিংবা কাবার ভিত্তি স্থাপনের সময় ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমুস সালাম)-এর করা দুআ,[৫৬]

অথবা আল্লাহর কাছে—মিসর ছেড়ে যাবার পর,[৫৭] বা ফিরআউনের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছানোর জন্য নিজের বক্ষকে প্রশস্ত এবং জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য[৫৮]—সাহায্য চেয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর করা দুআ।

এসব জনপ্রচলিত দুআগুলো ছাড়াও পূর্ববর্তী নবি-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-দের আরও অনেক দুআ ও আমল রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

[৫৪] সূরা আরাফ, ৭ : ২৩।
[৫৫] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৭।
[৫৬] সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৭।
[৫৭] সূরা কাসাস, ২৮ : ২৪।
[৫৮] সূরা ত্বহা, ২০ : ২৫-২৮।

আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে শিখিয়ে গেছেন।

তবে এই বরকতের সাথে সাথে পূর্ববর্তী নবি-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-দের সময়কার ভয়াবহ এমনসব ফিতনাও বর্তমান সময়ে মানবজাতিকে ঘিরে ধরেছে, যেগুলো—তাঁদের (আলাইহিমুস সালাম) একেকজনের ক্বওম বা জাতিগুলোর নিজস্ব, পৃথক পৃথক সীমালঙ্ঘন হলেও—বর্তমানে শয়তান, দাজ্জাল ও তার দোসরদের দ্বারা সে সবগুলোর একযোগে ও পূর্ণ উদ্যমে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ও ঘটছে।

আর এই ফিতনাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'শিক্ষিত', 'সভ্য' ও 'ইন্টেলেকচুয়াল' পশ্চিমের সেই আন্দোলন—যা নিজের ঘৃণ্য ও বিষাক্ত মতবাদ ছড়িয়ে দিতে বেছে নিয়েছে রব্বুল আলামীনের অনিন্দ্যসুন্দর এক সৃষ্টি, রংধনুকে।

যে ঘৃণ্য সীমালঙ্ঘনের কারণে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর ক্বওম বা জাতি ধ্বংস হয়েছিল, বর্তমান সময়ে পুরো বিশ্বজুড়ে চলছে সেই হোমোসেক্সুয়ালিটি বা সমকামিতারই জয়জয়কার।

সমকামিতার 'বৈধতা' এবং সমকামীদের 'অধিকার' নিয়ে হচ্ছে সীমাহীন আলোচনা ও আন্দোলন, চলছে সকল ধরনের মিডিয়ার মাধ্যমে এই বিকৃতিকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

এমনকি সমকামিতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষের 'আধুনিকতা' আর 'প্রগতিশীলতা' মাপার কাজেও।

বর্তমান পৃথিবীতে সমকামীদের ব্যাপারে আপনার মনোভাব ও বক্তব্য জানান দিবে যে, আপনি তথাকথিত 'সভ্যদের' জাতে উঠতে পেরেছেন কি না; সমকামিতার ব্যাপারে আপনার অবস্থান দেখে নির্ণয় করা হবে, আপনি কি 'ইন্টেলেকচুয়াল' না কি 'পশ্চাৎপদ'।

কিন্তু এই সমকামিতা জিনিসটা যে ঠিক কোন অবিসংবাদিত মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ, আর কেন-ই বা আমাদেরকে তা অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে এবং সম্মান করতে হবে–সেটাই হলো আসল প্রশ্ন।

তবে বিস্তৃত তত্ত্বকথায় গিয়ে লেখার কলেবর বাড়ানোর কোনো ইচ্ছে আপাতত নেই। কাজেই সোজাসাপ্টা কিছু আলোচনা করা যাক ইন শা আল্লাহ।

যখনই কোথাও সমকামিতার ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী বা তাঁর দেয়া ফিতরাতগত ঘৃণা প্রকাশ করা হয়, তখনই দেখা যায় যে, শয়তানের দোসররা তেড়ে এসে বলে—সমকামিতা ঘৃণার কোনো বিষয় নয়।

কিন্তু কেন সেটি তাদের কাছে ঘৃণার বিষয় নয়—সে ব্যাপারে কিন্তু তাদেরকে কখনো পরিষ্কার করে কিছু বলতে দেখবেন না।

আবার, তারা যদি কোনো কাজের প্রতি ফিতরাতগত ঘৃণাকে বাতিল মনে করতে পারে,

তাহলে উলটোভাবে তাদের সেই কাজটিকে ঘৃণা না করার ব্যাপারটাকেও কেন বাতিল মনে করা যাবে না?

কোন কাজটা ঘৃণ্য আর কোনটা নয়, অথবা কোন মনোভাবটা বাতিল বলে গণ্য হবে—সেটা ঠিক করে দেয়ার অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে, আর আমাদের সবার-ই বা কেন সেটা মানতে বাধ্য থাকতে হবে?

কিন্তু না, তারা বরং চোখ বুজে চলে যাবে সমকামিতার পক্ষে সবচাইতে বেশি বাজানো ভাঙ্গা রেকর্ডে, লিবারেল ধর্মের নৈতিকতার ভিত্তি—সম্মতি আর অপকার নীতির (Harm Principle) বিশ্বাসে।

অর্থাৎ, সেই মুখস্থ বুলি, যে দুইজন মানুষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেকোনো কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন, যদি না সেটা অন্যের ক্ষতি করে।

কিন্তু যদি এই একই— সম্মতি আর অপকার নীতির —ব্যাপারটা ইনসেস্ট বা অজাচারের ওপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে?

কথাটা শুনতে কি খারাপ লাগল?

ঘৃণায় গা গুলিয়ে উঠছে?

একই পরিবারের সদস্য—ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে—এরা যদি নিরোধক ব্যবহার করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে না তারা কারও ক্ষতি করছে, আর না তাদের মধ্যে সম্মতি নিয়ে কোনো সমস্যা আছে।

তাহলে কেন ইনসেস্ট বা অজাচারের ব্যাপারে মনে 'ঘৃণা' সৃষ্টি হবে?

এই অতীব জঘন্য বিষয়টা টেনে আনার কারণ হলো তথাকথিত 'লিবারেলদের' দ্বিমুখীতাটা প্রকাশ করা।

এর একটা বাস্তব উদাহরণ হলো ইন্টারনেটে, বিশেষ করে ইউটিউবে একটু ঘাঁটলেই এমন অসংখ্য ব্যক্তিদের আপনি দেখতে পাবেন—পুরুষ ও নারী উভয়ই, এবং বেশ 'সভ্য' ও 'শিক্ষিত' বিশ্বেরই মানুষ—যারা সমকামিতা সম্পর্কিত কিংবা সমকামী চরিত্র-সংবলিত কোনো সিনেমা/টিভি সিরিজ/কার্টুন ইত্যাদির রিভিউ দেয়ার সময়

খুবই আনন্দ ও উৎসাহের সাথে এই বিকৃতিটির গুণগান গাইছে।

অথচ সেরকমেরই কোনো সিনেমা/টিভি সিরিজ/কার্টুনে দেখানো ইনসেস্ট বা অজাচারের ক্ষেত্রে দেখবেন সেই তারাই এই জিনিসটাকে 'নিতে' পারছে না, অথবা অস্বস্তিতে নানান অঙ্গভঙ্গি করে শরীর মোচড়াচ্ছে, বা মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে কিংবা বমি করার ভঙ্গি করছে।

এমনকি নৈতিকভাবে অবক্ষয়প্রাপ্ত পশ্চিমের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে সমকামিতার ঢোল পিটানো এদেশেরই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী প্রাণীদেরকেও কেউ চাইলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন যে, অজাচারের ব্যাপারে তাদের অবস্থান কী, অথবা তাদের পরিবারের কোনো সদস্যদের অজাচার তারা কীভাবে নেয় বা নিবে।

মালিকুল মূলকের দেয়া ফিতরাতের ছিটেফোঁটাও যদি তাদের ভেতরে থেকে থাকে, তাহলেও এই জঘন্য বিষয়টির প্রতি ঘৃণার ভাব তাদের কথায় অথবা হাবভাবে ফুটে উঠতে বাধ্য।

কিন্তু কেন?

প্রশ্নটা এখানেই।

কেন সমকামিতার ক্ষেত্রে সম্মতি আর অপকার নীতির ধোঁয়া তুলে এই বিকৃতির প্রতি ফিতরাতগত ঘৃণাকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথচ সম্মতি আর অপকার নীতির পূর্ণ সংরক্ষণ সত্ত্বেও আরেক বিকৃতি অজাচারের ক্ষেত্রে সেই ফিতরাতগত ঘৃণাকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে?

এর দ্বারা কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, লিবারেল ধর্মের এই তথাকথিত নৈতিকতার ভিত্তি— সম্মতি আর অপকার নীতি —উপরোক্ত এ সকল বিকৃতির প্রতি মানুষের ফিতরাতগত ঘৃণাকে এড়াতে কিংবা বাতিল করতে (override) সক্ষম নয়?

ব্যাপারটা আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে চাইলে ধরুন পেডোফিলিয়া বা শিশুকামের কথা।

সমকামিতার অধিকাংশ সমর্থকদেরকেও কিন্তু আপনি এই শিশুকামের ব্যাপারটাকে সমর্থন করতে দেখবেন না; বরং তাদের বেশিরভাগকেই দেখবেন এটাকে ঘৃণার চোখে দেখতে।

শিশুকামের প্রতি তাদের এই ঘৃণা কিন্তু একেবারে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট—এই ঘৃণা হলো কোনো শিশুদেহের প্রতি যৌন আকর্ষণের খোদ অনুভূতিটার প্রতিই ঘৃণা।

খেয়াল করুন, এখানে ঘৃণার জন্য কিন্তু কোনো ব্যক্তির কোনো একটি শিশুর সাথে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হবারও প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র একটি শিশুর প্রতি যৌন আকর্ষণটাকেই এক্ষেত্রে ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে।

অথচ অবক্ষয়প্রাপ্ত পশ্চিমে কিন্তু—শিশুরাও যে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কনসেন্ট বা সম্মতি দেবার সক্ষমতা রাখে—সেটারও বিস্তর আলাপ-আলোচনা আছে।[৫৯]

আর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কারও ক্ষতি না করে কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুর সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হলে তো অপকার নীতিরও ল্যাঠা চুকে যায়।

তবুও কেন পেডোফিলিয়া বা শিশুকামের ক্ষেত্রে লিবারেলিজমের দোহাই দিয়ে কনসেন্ট আর অপকার নীতি পর্যন্তও যাওয়া যাচ্ছে না, বরং গোড়াতেই কোনো শিশুদেহের প্রতি যৌন আকর্ষণের অনুভূতিটাকেই ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে?

তারপরও কি এইসমস্ত ঠুনকো, মানবরচিত 'নৈতিকতার' অসারতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে না?

ক্বওমে লূত ২.০ এবং এর পালে হাওয়া দেয়া লিবারেলিজমের এই যৎসামান্য মুখোশ উন্মোচনের এ পর্যায়ে, তথাকথিত 'সমকামী অধিকার' আন্দোলন নিয়েও কিছু আলোচনা করা যাক ইন শা আল্লাহ।

লেখার শুরুতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে পুরো বিশ্বজুড়েই চলছে সমকামিতার 'বৈধতা' এবং সমকামীদের 'অধিকার' নিয়ে সীমাহীন আলোচনা ও আন্দোলন।

তবে এই 'বৈধতা' আর 'অধিকার'-এর ধোঁয়া তুলে এসব বিকৃতমনারা আসলে ঠিক কী চাচ্ছে সেটা স্পষ্টভাবে বোঝার দরকার আছে।

বিকৃতমনা সমকামী এবং তাদের দোসরদের গলা চড়িয়ে বলতে দেখা যায় যে, তারা সমকামীদের 'অধিকার' নিশ্চিত করতে চায়।

কিন্তু তাদের ঘুণে-খাওয়া আদর্শের রঙিন চশমাটা চোখ থেকে একটু সরালেই বুঝা যায় যে, তারা আসলে 'সমকাম করার' অধিকার নিশ্চিত করতে চায়।

ব্যাপারটা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে, যদি এই 'সমকামী অধিকার' আন্দোলনের 'অধিকার' অংশটাকেই ভালোভাবে ধরতে পারা যায়।

---

[৫৯] https://www.lostmodesty.com/2018/09/আপেক্ষিক-নৈতিকতা-ও-পেডোফ/

এসব বিকৃতমনাদের সমাজ দ্বারা তথাকথিত 'বৈষম্যের' শিকার হওয়ার বিষয়টা দেখা যায় 'সমকামিতা'-কে আলাদা একটা পরিচয় হিসেবে দাঁড় করানোর পরই তৈরি হয়।

অন্যথায় এই ঐচ্ছিক যৌন আচরণটা সমীকরণ থেকে বাদ রেখে দেখলে কিন্তু তারাও সমাজের আর দশজন মানুষের মতো একই অধিকার ভোগ করে থাকে।

তাহলে—হোমোসেক্সুয়াল বা সমকামীরা, হেটেরোসেক্সুয়াল বা বিসমকামীদের মতো একই অধিকার চায়—এ কথা বলার অর্থটা কী?

একথা বলার মানে হলো যে, এই বিকৃতমনারা তাদের খোদ এই বিকৃত যৌন আচরণটারই গ্রহণযোগ্যতা চায়।

তারা চায়, তাদের সমকামিতার কথা সবাই জানুক। তারা চায় যে, ঢাকঢোল পিটিয়ে সমাজের সকলকে জানিয়েই তারা এই বিকৃত যৌনাচারে অংশগ্রহণ করবে, আর সবাই তাদের এই বিকৃতিকে সমর্থন করবে, সম্মান করবে, এবং সমাজের সর্বস্তরে তাদের এই বিকৃতির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

অর্থাৎ, একটু আগেই যেই ব্যাপারটা বলা হলো যে, তারা আসলে 'সমকাম করার' অধিকার নিশ্চিত করতে চায়—সহজ কথায় এটাই হলো তাদের 'সমকামী অধিকার' আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

যেমন ধরুন, সমাজের কোনো চোর/ডাকাত বা অপরাধী তার নিজের প্রাপ্য অধিকারের কথা বলতেই পারে।

কিন্তু তার অধিকার নিশ্চিত করার মানে তো আর এই না যে, তাকে চুরি/ডাকাতি বা অপরাধ করার সুযোগ দিতে হবে, কিংবা তার চুরি/ডাকাতি বা অপরাধকে নৈতিকভাবে সমর্থন করতে হবে বা মেনে নিতে হবে।

ঠিক এই জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই-ই এইসব সমকামী বিকৃতমনা আর তাদের দোসররা করে থাকে।

এরা ধোঁয়া তুলে এই বিকৃত আচরণকারীর অধিকার নিয়ে, অথচ আসল প্রশ্নটা হলো এই বিকৃতিটার নৈতিকতা নিয়ে।

এরপরও কি আমাদের বুঝে আসবে না যে, এরা আসলে ঠিক কোন 'অধিকার'-টা আদায়ের জন্য আন্দোলন করে?

এই বিকৃতমনারা 'সমকামী অধিকার'-এর নাম দিয়ে তাদের খোদ 'সমকাম করার

অধিকার' পাবারই আন্দোলন করবে;

আর এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তাকে বা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে 'হোমোফোবিক', 'টক্সিক মেন্টালিটি', 'অসহনশীলতা', 'হেইট ক্রাইম' ইত্যাদি মুখস্থ বুলি ছাড়া হবে, এমনকি পচে যাওয়া সমস্ত ঠুনকো আদর্শের ওপর দাঁড়ানো রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে শাস্তির ব্যবস্থাও করা হবে।[৬০]

যদি সমকামিতার প্রতি ফিতরাতগত ঘৃণা রাখার কারণে কাউকে 'হোমোফোবিক' তকমা দিয়ে আক্রমণ করা হয়, তাহলে কি ওপরের আলোচনা অনুযায়ী ইনসেস্ট বা অজাচারকে ফিতরাতগত কারণে ঘৃণা করা কোনো ব্যক্তিকেও 'ইনসেস্টফোবিক', 'টক্সিক' ইত্যাদি ট্যাগ লাগিয়ে আক্রমণ করা যাবে? বা লিবারেলিজমের মাতম তুলে তাকে সহনশীলতার সবক দেয়া যাবে?

এতকিছুর পরও কি আমাদের উপলব্ধি হবে না যে, তারা আসলে কার অভিশপ্ত এজেন্ডা বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লেগেছে?

যাই হোক, লিবারেল ধর্মের নৈতিকতার ভিত্তি, অর্থাৎ সম্মতি আর অপকার নীতির বিশ্বাসের ওপর ছোট্ট একটা অনুশীলনী দিয়ে আলোচনাটা আপাতত এখানেই শেষ করা যাক।

অনুশীলনীটা একটু খেয়াল করে দেখুন তো, সেটার কী সমাধান পাওয়া যায়।

কেউ ইচ্ছা করলে অনুশীলনীটা নিজেদের পরিচিত সমকামী বিকৃতমনা বা তাদের দোসরদেরকে জিজ্ঞেস করেও দেখতে পারেন ইন শা আল্লাহ।

ধরুন, 'লিবারেল', 'ইন্টেলেকচুয়াল', 'সভ্য' ও 'শিক্ষিত' কোনো একজন ব্যক্তি সমকামিতাকে সমর্থন ও সম্মান করে ঠিকই, কিন্তু অজাচারকে ঘৃণা করে।

তো, একদিন যদি সে ব্যক্তির এমন কোনো সমকামী জুটির সাথে সাক্ষাৎ হয়, যারা একই পরিবারের সদস্য—হতে পারে তারা পরস্পর দুই ভাই বা দুই বোন, বাবা-ছেলে কিংবা মা-মেয়ে—তাহলে এই ব্যক্তির ঠিক কী অনুভব করা উচিত?

সেই জুটি সমকামী বলে তাদেরকে সমর্থন ও সম্মান করা উচিত, না কি তারা অজাচারী বলে তাদের প্রতি ঘৃণায় গা গুলিয়ে আসা উচিত?

---

[৬০] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50861259
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/12/20/he-burned-churchs-lgbtq-flag-got-years-they-responded-by-advocating-him
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/iowa-man-sentenced-15-years-after-burning-church-s-lgbtq-n1105131

সম্মতি আর অপকার নীতির ভিত্তিতে যদি সেই জুটির সমকামকে সমর্থন ও সম্মান করা যায়, তাহলে তাদের অজাচারকে কেন নয়?

আর যদি আল-খালিক্বের দেয়া ফিতরাত অনুযায়ী অজাচারের বিকৃতিকে ঘৃণা করা যায়, তাহলে সমকামের বিকৃতিকে কেন নয়?

আবার এর সাথে ধরুন, সেই সমকামী ও অজাচারী জুটিতে যদি পেডোফিলিয়া বা শিশুকামের বিষয়টিও যুক্ত থাকে—অর্থাৎ দুই ভাই বা দুই বোনের জুটিতে একটি ভাই বা বোন শিশু, অথবা বাবা-ছেলের জুটিতে ছেলেটি শিশু, কিংবা মা-মেয়ের জুটিতে মেয়েটি শিশু—তাহলে?

সম্মান ও ঘৃণার চালে-ডালে মিশে খিচুড়ি হয়ে কি সেক্ষেত্রে একেবারে নৈতিকতার ওভারডোজ হয়ে যাবে?

মোটকথা, সমর্থন ও সম্মান হবে কীসের ভিত্তিতে, আর ঘৃণা-ই বা হবে কীসের ভিত্তিতে—অর্থাৎ নৈতিকতার মানদণ্ড হবে ঠিক কোনটা—এটাই হলো উপরোক্ত আলোচনার মূলে থাকা চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে গুরুত্ববহ প্রশ্ন।

একবার এই উপলব্ধিটা আসলেই এবং তদনুযায়ী সত্য পথের সন্ধান করতে পারলেই হলো, এ ধরনের কোনো বিভ্রান্তি আর কখনোই মস্তিষ্কে জট পাকাতে সক্ষম হবে না ইন শা আল্লাহ।

কাজেই চিন্তা করুন[৬১], মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হোন।

---

[৬১] '...এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো।' [সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৯]
⇨ '...এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করো।' [সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬৬]
⇨ '...আপনি বলে দিন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করো না?' [সূরা আনআম, ৬ : ৫০]
⇨ '...আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা করো না?' [সূরা আনআম, ৬ : ৮০]
⇨ '...নিশ্চয়ই আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা চিন্তা করে।' [সূরা আনআম, ৬ : ৯৮]
⇨ '...ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব; কাজেই কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। তোমরা কি কিছুই চিন্তা করো না?' [সূরা ইউনুস, ১০ : ৩]
⇨ 'তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন, এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত ও নদনদী এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দুটি করে প্রকার সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। এবং জমিনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে—একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙুরের বাগান আছে আর শস্য ও খর্জুর রয়েছে—একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বার সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দিই। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে নিদর্শন আছে তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।' [সূরা রা'দ, ১৩ : ৩-৪]
⇨ '...আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।' [সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৫]

⇨ 'এটা (কুরআন) মানুষের জন্য একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই -একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানেরা চিন্তাভাবনা করে।' [সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৫২]

⇨ 'তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব রং-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।' [সূরা নাহল, ১৬ : ১৩]

⇨ 'যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি তবে চিন্তা করবে না?' [সূরা নাহল, ১৬ : ১৭]

⇨ 'আমি এই কুরআনকে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখীতাই বৃদ্ধি পায়।' [সূরা ইসরা, ১৭ : ৪১]

⇨ 'তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না...?' [সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৬৮]

⇨ '...বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।' [সূরা যুমার, ৩৯ : ৯]

⇨ 'তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন রুযি। চিন্তাভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে ঋজু থাকে।' [সূরা গাফির, ৪০ : ১৩]

⇨ 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪]

⇨ 'যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।' [সূরা হাশর, ৫৯ : ২১]

ইসলাম ও নারীবাদ

তানভীর আহমেদ

Feminism বা নারীবাদ এর সংজ্ঞায়নে স্বয়ং নারীবাদীরা নিজেরাই এত মত-পথ বের করেছে যে, তাদেরকে সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করলে একেকজন একেকরকম উত্তর দেয়। বিশেষ করে নারীবাদের পুরোনো সংজ্ঞা যা মূলত 'নারীদের সমঅধিকার' কেন্দ্রিক—সেটাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে এতই নাজেহাল করা হয়েছে যে, স্বয়ং নারীবাদীরাই নারীবাদের সংজ্ঞা নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এসেছে Neo-Feminism (নব্য নারীবাদ), যা মূলত নারীবাদীদের Gender Wage Gap (লিঙ্গভিত্তিক বেতন বৈষম্য) আর চয়েস নিয়ে আবর্তন করে। আর যদিও বাঙ্গাল নারীবাদীদের বেশিরভাগই এখনো এতদূর যায়নি, তবুও শেষে নব্য নারীবাদ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় আলোচনা থাকবে ইন-শা-আল্লাহ। কারণ, ইন্টারনেট-স্মার্টফোনের যুগে ইতোমধ্যেই নব্য নারীবাদের বাতাসে কেউ কেউ অসুস্থ হয়েছে; আর কিছুদিনের মধ্যেই যে তা পুরোদমে মহামারীতে রূপ নেবে তাও মোটামোটি নিশ্চিত।

'সম' সংশয়

প্রথমে আভিধানিক সংজ্ঞাতেই চোখ বুলানো যাক। অক্সফোর্ড ডিকশনারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী নারীবাদ হলো, 'The advocacy of women's rights on the ground of the equality of the sexes.' আর কেমব্রিজ ডিকশনারীর সংজ্ঞা হলো, 'The belief that women should be allowed the same rights, power, and opportunities as men and be treated in the same way, or the set of activities intended to achieve this state.'

অর্থাৎ, নারীবাদ গড়েই উঠেছে নারীদের 'সম' অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। লক্ষ্যণীয়, এখানে আগেই ধরে নেয়া হয়েছে যে, 'সম' মানেই হলো 'সঠিক'। আসলেই কি তাই? নারী-পুরুষ সব জায়গায় সমান সমানভাবে থাকবে, সব জায়গায় সমান সমান অধিকার ভোগ করবে সেটাই কি ন্যায়? আদতে বাস-ট্রাক চালানো, গলা ফাটিয়ে হেল্পারি করা-সহ ভারী ভারী যত কাজ রয়েছে—সেসব বিষয় সামনে নিয়ে এলে নারীবাদীদের তোলা 'সম' অধিকারের আস্ফালন আর শোনা যায় না। কেবল অফিস-আদালতে এসির বাতাস খেতে খেতে ভাবমারা কর্পোরেট জব করার সময় সমঅধিকারের যত বুলি আওড়ানো হয়।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক, একটা নির্মানকাজের জন্য দিনমজুর নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সেখানে লাইনে কিছু পুরুষ আর মহিলা দাঁড়াল। লোক নিয়োগ শেষে দেখা গেল, পুরুষ বেশি নিয়োগ দেয়া হয়েছে আর মহিলা কম। মহিলাদের যেসব কাজ দেয়া হয়েছে তাও অপেক্ষাকৃত কম কষ্টের, মজুরিও নির্ধারণ করা হয়েছে সে অনুযায়ী। এখন নারীবাদীদের অবস্থা হলো এমন—তারা দাবি করছে, তারাও পুরুষদের সমান সংখ্যায় কাজ করবে, আর একই সময় পরিমাণ কাজ করার পরিবর্তে তাদেরকে একই পরিমাণ মজুরি দিতে হবে। এই হলো তাদের সংজ্ঞার 'সমঅধিকারের' প্রায়োগিক রূপ। অথচ তারা নিজেরাও জানে এ কাজে তারা চাইলেও পুরুষদের সমান আউটপুট দিতে পারবে না।

বাস্তবতা হলো এই যে, কিছু কাজ রয়েছে যা পুরুষদের জন্য, আবার কিছু কাজ রয়েছে যা মহিলাদের জন্য। স্বয়ং আল্লাহর নির্ধারণ করে দেয়া এই বাস্তবতাকে যারা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না, নিজেদের এই ফিতরাতবোধ যারা নষ্ট করে ফেলেছে, তারাই সমঅধিকারের অসাড় আস্ফালন করে থাকে। তাই নারীবাদীরা যত দ্রুত সত্য মেনে নিতে পারবে, ততই তাদের মঙ্গল। আর 'সম' মানেই সত্য নয়, সঠিক নয়। বরং যে যেখানে উপযুক্ত সেখানেই সে সঠিক, সত্য।

লিঙ্গভিত্তিক বেতন বৈষম্য (Gender Wage Gap) বিষয়ক মিথ

নারীবাদীদের ব্যবহৃত এক কল্পনাপ্রসূত অসার যুক্তি হলো Gender Wage Gap বা চাকরি-বাকরিতে 'বেতন-বৈষম্য', যা নব্য নারীবাদ বা নিও ফেমিনিজমের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ, ভারী সব কাজ বাদ দিয়ে নারীবাদীরা যেসব জায়গায় নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে চায় সেখানে না কি তারা অধিকার(!) আর বেতন-বৈষম্যের শিকার হয়। খতিয়ে দেখা যাক। (ইসলামের দৃষ্টিকোণ কিছুক্ষণ পরে আলোচিত হবে, প্রথমে সেক্যুলার দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচিত হলো।)

আমেরিকায় করা বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী তথাকথিত বেতন-বৈষম্যের পরিমাণ ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রতি একজন কর্মজীবী সাধারণ পুরুষ ১০০ ডলার আয় করলে প্রতি একজন কর্মজীবী সাধারণ নারী আয় করে ৭৭ ডলার। নব্য নারীবাদীদেরকে প্রায় সবসময়ই এই ধরনের মুখস্ত তথ্য ব্যবহার করতে দেখা যায়। অথচ একইসাথে এসব জরিপ আর গবেষণায় উল্লেখিত বেতন বৈষম্যের যেসমস্ত কারণগুলো উল্লেখ করা হয়, সেগুলো আর বলতে শোনা যায় না। বাস্তবতা হলো, পুরুষ আর নারীদের বেতন ব্যাবধানের পেছনে কিছু কারণ কাজ করে, যার প্রথমেই রয়েছে নারীদের Choice বা বেছে নেয়া। এমনকি American Association of University Women—যা কিনা একটা নারীবাদী সংস্থা—তাদের দেয়া প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে বিদ্যমান এই বেতন-বৈষম্যের প্রধান কারণগুলো হলো পেশা, পদবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের ঘণ্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরুষ আর নারীর ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ।[৬২] সেখানে বলা হয়েছে, নারীরা নিজেরাই পড়ালেখা করার সময় এমন সব বিষয়াদি বেছে নেয়, যার বাজারমূল্য কম। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রেও তাদের পদবি, দায়িত্ব, সংসারের জন্য ওভারটাইম না করা ইত্যাদি কারণে এমন বেতন-ফারাক সৃষ্টি হয়েছে যা অতি স্বাভাবিক।

আর এই বিভিন্ন কার্যকারণগুলো বিবেচনা করলে বেতন ফারাক এসে দাঁড়ায় মাত্র ৬.৬% এ। আর এরও কারণ শুধুমাত্র নারী-পুরুষের পছন্দ করে নেয়ার বিভিন্নতা। একজন নারী তাঁর সংসার সামলানোর জন্য যেখানে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে উদ্যত হন, সেখানে একজন পুরুষ সেই সংসারের জন্যই ওভারটাইম কাজ করতেও দ্বিধা করেন না। অর্থাৎ, ক্যারিয়ার বেছে নেবারর বিভিন্নতার কারণেই এই ব্যাবধান বা ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলো কিন্তু নারীবাদীদের একদমই পছন্দ না। ২০০৯ সালে U.S. Department of Labor এর প্রকাশ করা 'An Analysis of Reasons for the Disparity in Wages Between Men and Women' প্রতিবেদনেও একই তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, যা কি না ৫০টিরও বেশি পিয়ার রিভিউ গবেষণা থেকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। সেখানেও বলা হয়েছে, বিদ্যমান বেতন ফারাকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছইন্দ বিবেচনা করলে রীতিমতো কোনো ফারাকই আর বিবেচ্য থাকে না। সেগুলো নিয়ে আন্দোলন আর উচ্চবাচ্য করা তো হাস্যকর ব্যাপার।[৬৩]

বাস্তবে দেখা যায়, দুইজন পুরুষ একই পদে সমান সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কাজ করলেও একজনের আগে আগে পদোন্নতি হয়ে যায়। এটা অতি স্বাভাবিক একটা বিষয়। কর্মক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা অনুযায়ী পদোন্নতি হয়। এখন নিজেদের পছন্দের

[৬২] https://tinyurl.com/cwssb8w.
[৬৩] https://tinyurl.com/y6vvzm4v.

কারণে অল্প আউটপুট দিয়েও যদি কিছু বুদ্ধিহীন ব্যক্তি একই পরিমাণ বেতন দাবি করে, তা তো বোকামি আর অন্যায় দাবি ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া—

এক.

যদি একই পরিমাণ আউটপুট দিয়েও নারীদের বেতন কম হতো, তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর ইন্ডাস্ট্রিগুলো একই পোস্টে সব পুরুষ বদলে নারী বসায় না কেন? খরচ বাঁচানো ব্যবসাগুলোর একটা অন্যতম লক্ষ্য; আর যেহেতু একই কাজে সব নারী নিয়োগ দিলে প্রতি ১০০ ডলারে ২৩ ডলার বেঁচে যায়, তাহলে কেন তারা সব নারী নিয়োগ দিয়ে খরচ কমিয়ে ফেলছে না? আদতে বাস্তবতা হলো, বেশি অর্থ দিয়ে হলেও যোগ্যদেরকেই কাজ দেয়া হয়। এখন অযোগ্য কেউ এসে যোগ্যদের সমান সমান সবকিছু পেতে চাইলেই তা ন্যায় হয়ে যায় না, বরং চরম অন্যায় হয়।

দুই.

একটা প্রতিষ্ঠানের কোনো পোস্টে কাকে নিয়োগ দেয়া হবে, কত বেতন দেয়া হবে সেগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার। যাদেরকে যোগ্য মনে করা হয়, তাদেরকেই নিয়োগ দেয়া হয়; আর যত বেতনের যোগ্য মনে করা হয় তত বেতনেই নিয়োগ দেয়া হয়। প্রতিযোগিতার এই যুগে অযোগ্যরা যোগ্যদের জায়গা দখল করে বেতন ভোগ করতে থাকলে সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আর অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটবে—এ তো ক্লাস ফাইভের বাচ্চারাও বোঝে।

একে তো নারীবাদীদের 'সম মানেই সঠিক' এই কথার মাঝেই রয়েছে গলদ; তার ওপর সমস্ত প্রতিবেদনের তথ্যও যায় তাদের বিপরীত। একই প্রতিবেদনের একাংশ নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করে কারণগুলো লুকিয়ে আস্ফালন আর আন্দোলন করা অপরিণত মস্তিষ্কের পরিচয়ই বহন করে।

নিজ পছন্দের অবাধ স্বাধীনতা এবং সম্মতি

নারী স্বাধীনতার ফসল Consent (সম্মতি) আর Rape (ধর্ষণ) এর সম্পর্ক জানেন? খুব সহজ ভাষায় সংক্ষেপে বলি। নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ (Second wave feminism), পশ্চিমা সমাজে যার সূত্রপাত গত শতাব্দীর ষাট এর দশকে, ক্রমান্বয়ে তার মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠে এমন—নারীরা যেভাবে খুশি সাজবে, যখন খুশি বিছানায় যাবে কেউ তাদের এসব একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না, সহজ কথায় Freedom of Choice বা নিজ পছন্দের অবাধ স্বাধীনতা। ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির বিভ্রান্তিটা এখানেই। একজন নারী কারও সাথে স্বেচ্ছায় বিছানায় গেল,

কিন্তু পরবর্তীতে সে ধর্ষিত হয়েছে দাবি করলে পুরুষ বেচারার নিজের পক্ষে তেমন প্রমাণ-ই থাকে না। তাহলে বোঝা যাবে কী করে—নারী কি নিজের মতেই গিয়েছিল না কি আসলেই ধর্ষিত হয়েছে?

হার্ভি ওয়েনস্টিনরা প্রত্যেক সমাজের পরতে পরতে আছে। দু'এক জন সাহস করে নিজেদের হয়রানির কথা বলার পর হ্যাশট্যাগ me_too এর বন্যা বয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, এতদিন পর কেন হে ভগিনী! ওসব ঘটনায় তোমার যে সম্মতি ছিল না তা এক হ্যাশট্যাগ স্ট্যাটাস বা টুইটেই তো প্রমাণ হয়ে যায় না। আসল কথা হলো, ওরা নিজেরাই দেহ বিকিয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চেয়েছিল। ক্যারিয়ারের স্বার্থেই ঘটনার পরপর নিজেরা চুপ থাকত। 'বাহিরে মেয়েদের নিজেদেরকে প্রমাণ করতেই হবে'—প্রথমে এই বুলিতে ঘোল খেয়ে প্রমাণ করতে গিয়ে এরপর মান-সম্মান সব খুইয়ে আসে। তুমি তো সেদিন-ই নিজেকে অপদস্থ করেছ, যেদিন নেকড়েদের কাছে নিজেকে উজাড় করে প্রমাণ করতে গিয়েছিলে।

শিশুহত্যার লাইসেন্স ও নাস্তিক্যবাদী ইউটোপীয়া

নারী স্বাধীনতা থেকে অবাধ স্বাধীনতা...এরপর?

নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ ভয়াল রূপ নেয় আরও কয়েক বছর পরে এসে। 'নিজের শরীর, নিজের অধিকার' এর প্রতিপাদ্যে চলে আসে ব্যাভিচার করে ইচ্ছেমতো গর্ভপাত করার অধিকার চাওয়া! অর্থাৎ, শিশুহত্যার লাইসেন্স! ইউরোপ আমেরিকায় এসব নিয়ে আন্দোলন লেগেই থাকে। এগুলোই হচ্ছে নারীবাদীদের শেষদিকের কার্যকলাপ।

নিজ পছন্দের অবাধ স্বাধীনতার ধারণা আরও একটু বিস্তৃত হয়ে সমকামিদের সমর্থনও নারীবাদীরা আত্মস্থ করেছে। নিজেদের বাহিরে কাজ করাকে ধ্রুবক রেখে শিশুদের প্রয়োজনে ডে-কেয়ারে পাঠানো, অবাধ স্বাধীনতায় শিশু হত্যার লাইসেন্স জায়েজ করা, LGBT-দের সমর্থন—এভাবেই নারীবাদীরা স্রষ্টার বিধিবিধান অস্বীকার করা নাস্তিক্যবাদী সমাজব্যাবস্থার দিকে এগিয়ে যায়।

নারীবাদ নদী অসারতা থেকে উৎপন্ন হয়ে নাস্তিক্যবাদের সাগরে গিয়ে মেশে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীবাদ

পদে পদে অপদস্থ হওয়া নারীবাদীরা দেখল, কিছু ধর্মভীরু নারী রয়েছে—বিশেষ করে মুসলিমাহরা—তারা আপন ঘরে থেকে নিজেদের আব্রু রক্ষা করে স্বামী-সন্তান

নিয়ে সুখে জীবনযাপন করছে। অতএব তাদেরও ঘর থেকে বের করে আনতে হবে। নেকড়েরা মিটিমিটি হাসে। আর নারীবাদীরা নিজেদের পরবর্তী দুরবস্থার কথা ঢেকে রেখে মুসলিমাহদের পুরোনো ঘোল দেয়া শুরু করে—নারীবাদের প্রথম ঢেউয়ের (First wave feminism) সময়কার কথাবার্তা যেসব কথায় তারা প্রথমে ধোঁকা খেয়েছিল। আগে বের হয়ে তো আসুক! প্রথমে নিকাব থেকে, এরপর হিজাব থেকে, এরপর ঘর থেকে, এরপর... আর কেউ কেউ নিকাব-হিজাব-সহই নিজেদের উজাড় করে দিয়ে প্রমাণ(!) করতে ব্যস্ত হয়। অন্যের কাছে প্রমাণ করতে গিয়ে যে তারা দাসত্বই করে যায়, তা আর টের পায় না।

অনেকে নারীবাদ বলতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা পর্যন্তই বোঝে। আর ইসলাম যেহেতু নারীকে সম্মানিত করেছে, তাই 'ইসলাম একটা নারীবাদী ধর্ম' বলে বলে প্রচার করতে থাকে। আদতে তারা নারীবাদের মূলকথা বোঝেনি অথবা ইসলাম সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। নারীবাদকে ভালো কোনো আদর্শ বলে মনে করে। এই ধারণা পুরোপুরি ভুল ও মিথ্যা। আসল কথা হলো, ইসলামে নারীর যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, এরপরেও যে অন্য কোনো আদর্শে খায়ের বা কল্যাণ খুঁজে সে প্রকাশ্যে বা গোপনে ধরে নেয় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন নারীদের যথেষ্ট সম্মান দেননি। নাউযুবিল্লাহ!

আনুগত্য

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত; আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নারীদের ওপর কর্তৃত্ব আর কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন, আর বান্দীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যথাযথ পর্দা করতে ও প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে থাকতে। তাদের ভরণপোষণ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর দায়িত্ব পুরুষদের দেয়া হয়েছে। এখন কেউ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া নির্দেশ মেনে নিবে, অথবা অস্বীকার করবে। দু'টো একসাথে চলতে পারে না।

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

'পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের-ওপর-অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে, নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হিফাযতযোগ্য করে

দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হিফাযত করো। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ।'[৬৪]

এই হলো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আয়াত—তিনি একজনকে আরেকজনের ওপর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, আর এ কারণেই পুরুষদেরকে করেছেন কর্তৃত্বশীল। স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীনতার কারণেই বেশিরভাগ নারী জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই বলে গিয়েছেন।

রাসূল ﷺ বলেন, 'আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছিল। আমি এরচেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছুই কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম এখানকার বেশিরভাগই হচ্ছে নারী।' সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'এমনটা কেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ?'

তিনি ﷺ বললেন, 'তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে।' প্রশ্ন করা হলো, 'তারা কি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ?'

তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, 'তারা হচ্ছে তাদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ। তারা অকৃতজ্ঞ তাদের স্বামীর সদাচারণের প্রতি। তুমি সারাজীবন তাদের প্রতি মমতা দেখিয়ে যাবে, কিন্তু এরপর সে যদি কখনো তোমার মধ্যে (অপ্রত্যাশিত) কিছু দেখতে পায়, তবে বলবে, "আমি তোমার মধ্যে কখনোই ভালো কিছু দেখিনি।"'[৬৫]

তাহলে কীভাবে একজন নারী একইসাথে আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলতে পারে, আবার শারীয়াতসম্মত কারণ ছাড়া পিতা বা স্বামীর অবাধ্য হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে 'ইসলামি নারীবাদ' একটা স্ববিরোধী জিনিস ছাড়া কিছুই না। আর প্রকৃত মুসলিমাহরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো আদর্শে খায়ের খোঁজেও না, আলহামদুলিল্লাহ।

পথের দাবি

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না

[৬৪] সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।
[৬৫] বুখারি, ১০৫২, সহীহ।

> করো মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সমীপে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৬৬]

এই আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা নারীদের বিনা প্রয়োজনে বাহিরে না যাবার দিকটা স্পষ্ট করে। অথচ আজ আমাদের সমাজে হিজাব করা বোনেরাও সুন্দর ক্যারিয়ার গড়তে চায়। আসলে তাদের দ্বীন যে অন্তরে প্রবেশ করেনি, এতে তা-ই সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের বললেন, 'তোমরা পথে বসা হতে বিরত থাকো।'

সাহাবিগণ আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের প্রয়োজনীয় কথার জন্য পথে বসার যে বিকল্প নেই।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'যদি তোমাদের একান্তই বসতে হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করবে।'

তখন সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, রাস্তার হক কী?' তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, 'দৃষ্টি অবনত করা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের উত্তর প্রদান করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া আর মন্দ কাজে বাধা দেয়া।'[৬৭]

সুবহানাল্লাহ! অপ্রয়োজনে বা অসার প্রয়োজনে সেই সাহাবাদের যুগেও পথে বসতে সাবধান করা হলো... তাও পুরুষদের। আর নারীদের কণ্ঠও যেখানে সতরের অন্তর্ভূক্ত, সেখানে তাদের অপ্রয়োজনে ক্যারিয়ারমুখী হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। আর ক্যারিয়ারমুখী হওয়া তো 'দুনিয়াবি' হওয়ার আরেক সংস্করণ, যা পুরুষদের জন্যও অকল্যাণকর। রাসূল ﷺ, তাঁর সাহাবাদের, সালাফদের যুহদ নিয়ে তো কিতাবাদির অভাব নেই।

কোনো উপায় না বুঝে বাধ্য হয়ে থাকলে পর্দা করে নারীদের বাহিরে কাজ করার অনুমতি থাকলেও আমাদের উচিত এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে যথার্থরূপে ভয় করা। এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলো দীর্ঘমেয়াদি হয়ে যায়; আর সচরাচর পরবর্তীতে গুনাহের দরজা খুলে দেয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, যা কিছু যাদের জন্য ফরয করা হয়নি তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ফিতনায় পতিত হওয়া বা ফিতনা ছড়ানো আল্লাহর ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানানো বৈ কিছু নয়।

---

[৬৬] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।
[৬৭] বুখারি, ৬২২৯, সহীহ।

স্বয়ং আল্লাহর ভারসাম্যকরণ

১. পুরুষের দায়িত্বের মূল্য

কোনোকিছুই মূল্য ছাড়া আসে না। আর পুরুষদেরকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেটাও চরম মূল্য ছাড়া আসেনি। আর সেই মূল্য হলো, আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা। দায়িত্বের মধ্যে থাকা নারীদের প্রতি সুবিচার না করলে, দ্বীনের সঠিক শিক্ষা না দিলে, বেহায়াপনা করতে দিলে যে আখিরাতে দাইয়্যুস হয়ে বা গুনাহগার হয়ে চরম মূল্য দিতে হবে পুরুষকে—সেসব কথা কিন্তু নারীবাদীরা এড়িয়ে যায়। তারা শুধু দুনিয়াতে তাদের ওপর কর্তৃত্ব দেয়ার ব্যাপারগুলোই বলে যায়। অথচ আখিরাতের হিসাব ছাড়া সবকিছুই অপূর্ণ। এছাড়া স্বয়ং আল্লাহর দেয়া বিধান নিয়ে প্রশ্ন করা তো শয়তানের চরম ধোঁকা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> 'পূর্ণ মুমিন সে-ই, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সে-ই, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।'[৬৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

> 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর থেকে ওয়াদাস্বরূপ নিয়েছ, আর তাদের সাথে সহবাস হালাল হয়েছে আল্লাহর কালাম দ্বারাই (এর দ্বারা ইজাব-কবুল উদ্দেশ্য)।'[৬৯]

এভাবেই দ্বীন ইসলাম নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং পুরুষদেরকে নিজেদের অধীনস্থ নারীদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছে। আরও অনেক আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা যাবে যেগুলো নারীদের ব্যাপারে পুরুষদের আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ছিলেন তাঁর স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম। পুরুষেরা এভাবেই আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ থাকে, আর আল্লাহভীরু পুরুষেরা তো নারীদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করতে পারে না। কিন্তু আজ তো নারী অধিকার হয়ে গিয়েছে ইচ্ছেমতো বেহায়াপনা করার অধিকার যেসবে গাফিলতি করলে পুরুষদেরও দাইয়্যুস হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি সংশোধনের ও নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায়ের তাওফিক দিন।

[৬৮] তিরমিযি, ১১৬২; মিশকাত, ৩২৬৪।
[৬৯] মুসলিম, ১২১৮, সহীহ; বাইহাকি, ৮৮৪৯।

২. নারীর মর্যাদা ও দ্বীন সহজীকরণ

স্বামীর আনুগত্য, মাহরাম ছাড়া ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা, নফল সাওম রাখতে স্বামীর অনুমতির হাদীস—কারণ আল্লাহ পুরুষদের কামনা-বাসনা বেশি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন—ইত্যাদি যারা অস্বীকার করতে চায়, তারা আসলে আল্লাহর দেয়া ফিতরাতকেই অস্বীকারের মাধ্যমে দ্বীন থেকেই নিজের অজান্তে বেরিয়ে পড়ে। অথচ একজন নেককার নারী মা হলে সেই মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত, তাদের জন্য যে মাত্র কয়েকটি বিষয় ঠিক করলেই নিশ্চিত জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, হাজ্জ করে আব্রু রক্ষা করে চলতে পারলে তা জিহাদের সমতুল্য করা হয়েছে সেসব কথা কিন্তু অব্যক্তই থেকে যায়। মোটকথা আখিরাতের পুরস্কারগুলোর কথা বাদ দিয়ে যখন কেবল দুনিয়ার সুযোগসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখনই শয়তানের ওয়াসওয়াসার জন্য তাদের অন্তর উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর ফলাফলস্বরূপ তারা নারীবাদে ধাবিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> 'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, আপন লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে—যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।'[৭০]

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد،
فقال: جهادكن الحج.

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি (অন্য রিওয়ায়াতে আছে, আমরা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের জিহাদ হলো হাজ্জ।"'[৭১]

আল্লাহু আকবার! এভাবেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলিমাহদের জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ করে দিলেন। কিন্তু কিছু অভাগা কেবল পার্থিব বিষয়াদি গণনা করতে গিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়ে বসে। তাদের চিন্তাগুলো কতই না বোকামিপূর্ণ!

---

[৭০] ইবনু হিব্বান, ৪১৬৩; সহীহ আল জামি, ৬৬০।

পরিশেষ

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আর ইসলাম ছাড়া অন্য যেকোনো আদর্শে যে-ই কল্যাণ খুঁজতে যাবে সে অপদস্থ হবেই। দুঃখজনক হলো, স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বান্দীদের সম্মানিত করলেও এই উম্মাতের কিছু অভাগা নারীবাদে খায়ের খুঁজে অপদস্থ হওয়ার পথই বেছে নিয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, আর সেখানে ইসলামের বেশ ধরেও অন্তরে ইসলামবিদ্বেষ পোষণ করে বা অন্তত কিছু আয়াত ও হাদীসের বিরোধিতা করে কিছু মানুষ নাস্তিক্যবাদী নারীবাদ আলিঙ্গন করেছে। আর নিজেদের জন্য খরিদ করেছে লাঞ্ছনা ও আগুন।

আজ তাই শতকোটি পুরুষদেরকেও লজ্জা দেওয়া নুসাইবা বিনতু কাবদের (রদিয়াল্লাহু আনহা) দেখা যায় না।[৭২] আজ দেখা যায় না, সালাহউদ্দীন আইয়ূবীদের জন্ম দেওয়া মায়েদের। আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন এবং ইসলাম-ভিন্ন অন্যসব আদর্শের ধোঁকা থেকে ভাই ও বোনদের হিফাযত করুন। আমীন।

[৭২] তাঁর বীরত্বগাঁথার ইতিহাস জানতে দেখুন : কানজুল উম্মাল, ৩৭৫৮৯ – শারয়ী সম্পাদক

ইসলামে কি নারীমাত্রই অশুভ বা অমঙ্গলের প্রতীক?

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

অভিযোগ

ইসলাম ধর্মে নারী অশুভ বা নারীতে অমঙ্গল রয়েছে। মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, অমঙ্গ
তিন বস্তুর মধ্যে—স্ত্রীলোক, গৃহ ও পশুতে।

জবাব

এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস :

<u>**১.**</u>

دَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لاَحِقٍ، حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَىْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

> অর্থ : সাদ ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, পেঁচা অশুভ নয়, ছোঁয়াচে রোগ নেই এবং কোনো জিনিস অশুভ হওয়া ভিত্তিহীন। **যদি কোনোকিছুর মধ্যে অশুভ কিছু থাকত, তাহলে ঘোড়া, নারী ও বাড়ি এই তিন জিনিসের মধ্যে থাকত।**[৭৩]

[৭৩] সুনানু আবী দাঊদ, ৩৯২১।

২.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ

> অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সংক্রমণ ও অশুভ নেই; **তবে (যদি থাকে) (শুভাশুভ) রয়েছে তিনটি বিষয়ে—স্ত্রী, ঘোড়া ও গৃহে।'**[৭৪]

৩.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ

> অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **'নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ার ভিতরে অশুভের লক্ষণ আছে।'**[৭৫]

বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এ সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। ওপরের বর্ণনাগুলোই ঘুরেফিরে বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসগুলো দেখিয়ে ইসলামবিরোধীরা দাবি করেন, ইসলাম ধর্মে নারী এক প্রকার অশুভ বা অমঙ্গলজনক জীব। ইসলাম এভাবে নারীজাতিকে অবমাননা করেছে। আমরা এখন এহেন দাবির সত্যতা কতটুকু, তা যাচাই করে দেখব।

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যাখ্যা

এ সংক্রান্ত বর্ণনার ব্যাপারে সম্মানিত উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বেশ কিছু আলোচনা পাওয়া যায়।

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها ان أبا هريرة يحدث عن النبي

---

http://www.ihadis.com/books/abi-dawud/hadis/3921

[৭৪] মুসলিম, আস-সহীহ, ৫৬১১। https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=15481

[৭৫] বুখারি, আস-সহীহ, ৪৭২২। https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5028

صلى الله عليه وسلم انه قال : الطيرة من الدار والمرأة والفرس فغضبت فطارت شقة
منها في السماء وشقة في الأرض وقالت والذي أنزل الفرقان على محمد ما قالها رسول
الله صلى الله عليه وسلم قط إنما قال كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

অর্থ : আবূ হাসান বর্ণনা করেছেন, বানু আমীরের ২ জন লোক আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট এল এবং বলল, আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, নবি ﷺ বলেছেন, '**স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ার ভিতরে অশুভের লক্ষণ আছে।** (এটি শুনে) তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। রাগান্বিত অবস্থায় বললেন, "সেই সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ফুরকান (কুরআন) নাযিল করেছেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ মোটেও এমনটি বলেননি। তিনি আসলে যা বলেছেন তা হলো, জাহিলি যুগে লোকেরা এগুলোর ভেতরে অশুভ লক্ষণ আছে বলে মনে করত।"'

তাহকীক শুআইব আরনাউত : মুসলিমের শর্তানুযায়ী সনদ সহীহ।[৭৬]

قيل : لعائشةَ إنَّ أبا هريرةَ يقول قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الشُّؤمُ في ثلاثٍ في الدَّارِ والمرأةِ والفرسِ فقالت عائشةُ : لم يحفظْ أبو هريرةَ لأنه دخل ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : قاتَل اللهُ اليهودَ يقولون : إنَّ الشُّؤمَ في الدَّارِ والمرأةِ والفرسِ فسمع آخرَ الحديثِ ولم يسمعْ أولَه

অর্থ : আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট বলা হলো, আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '**তিনটি বিষয়ের মাঝে অশুভের লক্ষণ আছে- স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ায়।** আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) (পুরো বক্তব্যটি) সংরক্ষণ করতে পারেননি। কারণ, তিনি (মজলিসে) ঢুকছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, "আল্লাহ ইয়াহূদিদেরকে ধ্বংস করুন। তারা বলে, স্ত্রী, বাড়িঘর **এবং ঘোড়ার ভেতরে অশুভের লক্ষণ আছে।**" তিনি (সঠিকভাবেই) নবি ﷺ এর বক্তব্যের শেষের অংশটি শুনেছেন, কিন্তু বক্তব্যের ১ম অংশটি তিনি শোনেননি।' [বর্ণনাটি হাসান][৭৭]

---

[৭৬] মুসনাদু আহমাদ, ২৬০৭৬, সহীহ। http://islamport.com/d/1/mtn/1/89/3525.html আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে সহীহ সনদে অনুরূপ আরও বর্ণনা পাওয়া যায়। দেখুন : https://is.gd/2Nx0uZ

[৭৭] সিলসিলা সহীহাহ, ২/৬৯০, শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর মতে হাদীসটি হাসান। https://is.gd/YM83MN

আমরা এ সংক্রান্ত বর্ণনার ব্যাপারে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যাখ্যা দেখলাম। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর মতে, জাহিলি যুগে ইয়াহূদিদের থেকে এই বক্তব্য পাওয়া যেত যে, স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ার মাঝে অশুভের লক্ষণ আছে। এখানে নবি ﷺ তাদের নিকট ইয়াহূদিদের এই বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র। হাদীসের বর্ণনাকারী নবি ﷺ এর কথার শেষাংশ শুনেছেন, কিন্তু প্রথমাংশ শুনতে পাননি। তিনি যতটুকু শুনেছেন ততটুকুই বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে একটি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে; যেহেতু নবি ﷺ থেকে সেই কথার পূর্বেও আরেকটি বক্তব্য ছিল। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন অন্যতম সর্বোচ্চ হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন। তিনি উম্মাহর শিক্ষিকা। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। নবি ﷺ এর স্ত্রী হবার সুবাদে তাঁর থেকে এমন গভীরভাবে হাদীস শেখা সম্ভবপর হতো, যা অন্য অনেকের পক্ষেই সম্ভব হতো না।[৭৮]

এখানে আমরা আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনার ব্যাপারে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যাখ্যা আলোচনা করলাম। তবে অন্য সাহাবিদের থেকেও এ সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। আমরা এখন অন্য সাহাবিদের বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করব।

ইসলামে অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করা নিষিদ্ধ

বিশুদ্ধ হাদীসে বলা হয়েছে, কুলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাসই করা যাবে না। এমনটি করা (ছোট) শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ " . ثَلاَثًا " وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ "

> অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, **'কোনো বস্তুকে কুলক্ষণ মনে করা শিরক, কোনো বস্তুকে কুলক্ষণ ভাবা শিরক।' একথা তিনি তিনবার বললেন।** আমাদের কারও মনে কিছু জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তিনি তা দূর করে দেবেন।'[৭৯]

[৭৮] হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আরও কতিপয় সাহাবির ব্যাপারে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর মন্তব্য জানতে দেখুন : 'ইজাবাহ লি ইরাদি মা ইস্তাদরাকাত আয়িশা আলাস সাহাবা '- ইমাম বদরুদ্দিন যারকাশী – শারয়ী সম্পাদক

[৭৯] সুনানু আবী দাউদ, ৩৯১০, সহীহ।
http://www.ihadis.com/books/abi-dawud/hadis/3910
আরও দেখুন, ইবনু মাজাহ, ৩৫৩৮, সহীহ।
http://www.ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/3538

অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই, বরং শুভ লক্ষণ আছে—এই মর্মে নবি ﷺ থেকে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ.

অর্থ : আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আদওয়া" (সংক্রমণ/সংক্রামক ব্যাধি) ও **অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে শুভ লক্ষণ মানা আমার নিকট পছন্দনীয়।** (লোকেরা) বলল, **শুভ লক্ষণ কী? তিনি বললেন, উত্তম বাক্য।'** (অর্থাৎ, যে কথা শুনে মানুষের মাঝে আনন্দ ও আগ্রহের সৃষ্টি হয় – শারয়ী সম্পাদক)[৮০]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, **কুলক্ষণ বলে কিছু নেই,** পেঁচা অশুভের লক্ষণ নয়, সফর মাসের কোনো অশুভ নেই। কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকো, যেভাবে তুমি সিংহ থেকে দূরে থাকো।'[৮১]

কাজেই দ্বীন ইসলামে কোনো কিছুকে কুলক্ষণযুক্ত বা অশুভ ভাবার কোনো ব্যাপার নেই। হোক সে নারী বা অন্য কিছু। বরং ইসলামে শুভ লক্ষণে বিশ্বাস রয়েছে।

কিন্তু হাদীসে তো সরাসরি নারীকে অশুভ লক্ষণযুক্ত বলা হয়েছে!

কেউ কেউ দাবি করতে পারেন, কিছু হাদীসে তো সরাসরিই বলা আছে যে, নারীর মাঝে অশুভ লক্ষণ আছে! যেমন, এই প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখিত এই সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীসের ৩নং হাদীসে বলা হয়েছে—"الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ" (তোমাদের স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ার ভেতরে অশুভের লক্ষণ আছে)। হাদীসটির বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)।

এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয়। ২নং ও ৩নং উভয় হাদীসেরই বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। ২নং ও ৩নং হচ্ছে একই হাদীসের দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ৩নং এ কিছু কম শব্দে সংক্ষিপ্তরূপে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। একই হাদীস কোনো স্থানে বেশি শব্দে আবার কোনো স্থানে কম শব্দে বর্ণিত হবার ব্যাপারে

[৮০] বুখারি, ৫৭৭৬, সহীহ; মুসলিম, ৫৯৩৩-৫৯৩৪, সহীহ।
[৮১] বুখারি, ৫৭০৭, সহীহ।

ইমাম ইবনু হাযম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

'**বর্ণনাকারী কর্তৃক হাদীস সংক্ষিপ্তকরণ অর্থাৎ, বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ হাদীসটিই মুখস্থ করেছেন, কিন্তু এর কিছু অংশ এক স্থানে বর্ণনা করেছেন এবং এর সম্পূর্ণ অংশ অন্য কোথাও বর্ণনা করেছেন।** উদাহরণস্বরূপ : আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নবি ﷺ এর যুহর সালাতের ২ রাকাআত ভুলে যাবার হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এর পুরো ঘটনাটিও আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃকই বর্ণিত হয়েছে, এবং তা একই ঘটনা (আলাদা কোনো ঘটনা না)। এর দ্বারা বোঝা গেল, (রাবীদের) **কেউ কেউ (হাদীসের) কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করার ফলে বিভিন্ন বর্ণনায় ভিন্নতা (অর্থাৎ কোনো বর্ণনা দীর্ঘ, আবার কোনো বর্ণনা সংক্ষিপ্ত) দেখা যায়।** দেখুন : সহীহ বুখারি ৭১৪, ৭১৫, ১২২৯।"[৮২]

কাজেই এখানে আমরা দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ বর্ণনা থেকে এই হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করব। আর সম্পূর্ণ বর্ণনাটিতে সরাসরি এটি বলা নেই যে, নারীদের মাঝে অশুভ লক্ষণ আছে। বরং বলা হয়েছে, **'যদি কোনোকিছুর মধ্যে অশুভ কিছু থাকত তাহলে ঘোড়া, নারী ও বাড়ি এই তিন জিনিসের মধ্যে থাকত।'** এ দ্বারা মূলত কী বোঝানো হয়েছে? ঘোড়া, নারী ও বাড়ির ব্যাপারে কেন এমন কথা বলা হলো? একটু পরেই আমরা এ বিষয়ে হাদীস বিশারদদের ব্যাখ্যা দেখব ইন শা আল্লাহ। প্রবন্ধের শুরুতে সাদ ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ১নং হাদীসে আমরা দেখেছি, তাঁর ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে দীর্ঘ বর্ণনায় একই তথ্য আছে। নারীদের মাঝে অশুভের লক্ষণ আছে—বিষয়টি এমন নয়; বরং **'যদি** অশুভ কিছু **থাকত** তাহলে তা নারীর মাঝে থাকতে পারত'—এই কথা বলা হয়েছে। দু'টি বিষয় মোটেও এক নয়। এই বর্ণনা দ্বারা বরং বোঝা যাচ্ছে নারীরা অশুভ নয়; অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। আমরা ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর অভিমত দেখেছি যে, 'স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ার ভেতরে অশুভের লক্ষণ আছে' সরাসরি এমন কথা নবি ﷺ বলেননি। বরং জাহিলি যুগে এমনটি বলা হতো। সহীহ বুখারির ব্যাখ্যায় 'নাসরুল বারী' গ্রন্থেও এই কথার-ই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারি (রহিমাহুল্লাহ) দীর্ঘ বর্ণনাটি পরে এনে হাদীসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এবং এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, সত্ত্বাগতভাবে কোনো জিনিসে অশুভ বা অকল্যাণ নেই; অর্থাৎ, হাদীসে নারীজাতিকে মোটেও অশুভ বলে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। সেখানে বলা হয়েছে—

[৮২] আল ইহকাম, ১/১৩৪।

সূত্র : شرح القصيدة الميمية للآثاري في مدح خير الرسل ﷺ - خضر موسى محمد حمود بالذكور
https://is.gd/rEdN59

'ইমাম বুখারি (রহিমাহুল্লাহ) نحوست তথা অশুভ বা অকল্যাণ সম্পর্কে উভয়কে রিওয়ায়াত নকল করেছেন। দ্বিতীয় রিওয়ায়াত পরে এনে ইমাম বুখারি (রহিমাহুল্লাহ) উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদি কোনো জিনিসে অশুভ, অকল্যাণ থাকত তাহলে এই তিনটি জিনিসে হতো; যথা : ১. স্ত্রীলোক, ২. ঘোড়া এবং ৩. ঘর। সত্তাগতভাবে কোনো জিনিসে অশুভ বা অকল্যাণ নেই। যেমন : স্বয়ং ৭৬৩ পৃষ্ঠায় (নাসরুল বারী গ্রন্থে) আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, ذكروا الشوم عند النبي ﷺ الخ অর্থাৎ, রাসূল ﷺ এর নিকট মানুষেরা কুলক্ষণের কথা আলোচনা করল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যদি কোনো জিনিসে অশুভ বা অকল্যাণ হতো তাহলে ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘরে হতো। তো, এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সত্তাগতভাবে কোনো জিনিসে অশুভ বা অকল্যাণ নেই।'[৮৩]

আমরা দেখলাম যে, লোকেরা যখন নবি ﷺ এর সামনে কুলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণের ব্যাপারে আলোচনা করছিল, তখন তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, তা যদি আসলেই থাকত তবে তা এই তিন বিষয়ের মধ্যে থাকতে পারত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই, সেটি স্বয়ং নবি ﷺ বহু স্থানে বলেছেন। প্রসঙ্গ-সহ পুরো ঘটনা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে নারীজাতিকে অশুভ বা অলক্ষুণে বলে সাব্যস্ত করা মোটেও নবি ﷺ এর মাকসাদ ছিল না। শুধু তাই নয়, অন্যত্র নবি ﷺ থেকে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রীলোকের মাঝে শুভ লক্ষণ আছে!

عَنْ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ

> অর্থ : মিখমার বিন মুআবিয়াহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'অশুভ আলামাত বলতে কিছু নেই। অবশ্য তিনটি জিনিসে শুভ আলামাত আছে : স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও বাড়ি।'[৮৪]

হাদীসে বলা হয়েছে, স্ত্রীলোকের মাঝে শুভ লক্ষণ আছে। অথচ এই হাদীস কিন্তু ইসলামবিরোধীদের আলোচনার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তারা সব সময় সচেষ্ট থাকে কীভাবে কিছু হাদীস অপব্যাখ্যা করে ইসলামকে নারীবিদ্বেষী ধর্ম বলে প্রমাণ করবে।

একই হাদীসে ঘোড়ার ব্যাপারেও উল্লেখ ছিল। বিশুদ্ধ হাদীসে বলা হয়েছে

[৮৩] নাসরুল বারী শারহি সহীহুল বুখারি (আল-কাউসার প্রকাশনী), খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১১৭।

[৮৪] ইবনু মাজাহ, ১৯৯৩, হাসান।
http://www.ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/1993

ঘোড়ার ললাটে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। অর্থাৎ, ঘোড়াও অশুভ বা অকল্যাণকর নয়।

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

> অর্থ : আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **'আল্লাহ তাআলা কিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ বেঁধে রেখেছেন...।'**[৮৫]

হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো কোনোকিছু অলক্ষুণে বা অশুভ নয়। স্ত্রীলোক, ঘোড়া—আল্লাহর সব সৃষ্টিই শুভ ও কল্যাণকর। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ অশুভ লক্ষণকে অস্বীকার করেছেন।

হাদীস বিশারদগণের ব্যাখ্যা

এ সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> **'যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে যে—রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনোকিছুতে অশুভ লক্ষণ ও অমঙ্গলের প্রভাব এভাবে সাব্যস্ত করেছেন যে, সেটা আল্লাহ ব্যতীত নিজে থেকেই ক্ষতি করতে পারে—সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর মহা মিথ্যারোপ করেছে এবং সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। ...মোটকথা, তিনটি বিষয়ের (স্ত্রী, ঘোড়া ও গৃহ) মধ্যে অশুভ লক্ষণ থাকার কথা দ্বারা সেই জিনিসের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায় না, যার অস্তিত্ব তিনি পূর্বেই অস্বীকার করেছেন।**
>
> ... মহামহিম আল্লাহই ভালো ও মন্দের স্রষ্টা। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টির মাঝে কিছু জিনিস সৌভাগ্যজনক এবং বারাকাহযুক্ত হয়। যারা এগুলোর সংস্পর্শে আসে তাদের জন্য এগুলো আনন্দের কারণ হয়। কাজেই এরা বারাকাহময়। আবার আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কিছু জিনিস দুর্ভাগ্যজনক হয়। যারা এগুলোর সংস্পর্শে আসে তাদের জন্য এগুলো দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। আর এর সবকিছুই হয় তাঁর (আল্লাহর) ইচ্ছা ও নির্ধারণ অনুসারে। ঠিক যেমনভাবে তিনি অন্য বিভিন্ন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এর বিপরীত উপকরণের সাথে এগুলোকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। যেমন, তিনি মিসক (কস্তুরী) এবং অন্যান্য সুগন্ধি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর

[৮৫] সুনানুন নাসায়ী, ৩৫৬৩, সহীহ।
https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=77594

সংস্পর্শে এলে সুখানুভূতি তৈরি হয়। আবার তিনি এর ঠিক বিপরীত ধরনের কিছু বস্তুও সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর সংস্পর্শে এলে অপ্রীতিকর অনুভূতি হয়। এই দুই ধরনের বস্তুর পার্থক্য বোঝা যায় অভিজ্ঞতার দ্বারা। গৃহ, স্ত্রী ও ঘোড়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এটা এক বিষয়; আর অশুভ লক্ষণের ব্যাপারে শিরকি বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা বিষয়।'[৮৬]

তাকমিলা ফাতহুল মুলহিমের গ্রন্থকার মুফতি তাকি উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন,

'আমার মতে **এই হাদীসের প্রাধান্য ব্যাখ্যা এই যে, এর দ্বারা মর্ম হচ্ছে, এই তিনটি বস্তুতে [নারী, গৃহ, ঘোড়া] কুলক্ষণ প্রমাণিত করার দ্বারা প্রকৃত কুলক্ষণ প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়;** বরং এর মর্ম হচ্ছে, এই সকল বস্তু যখন স্বভাবের অনুকূলে না হয় তখন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাকে সর্বদা কষ্ট দিতে থাকে। যেমন, কুলক্ষণের প্রবক্তাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। আর বিশেষভাবে এই তিন বস্তুকে উল্লেখ করবার কারণ হচ্ছে, এগুলোর কারণে বড় এবং বেশি মুসিবতে পড়তে হয়। কেননা, প্রত্যেককেই এই তিনটি বস্তুর সাথে দীর্ঘ সংস্পর্শে থাকতে হয়। ...আর এটি সেই হাদীস দ্বারা তায়ীদ (দৃঢ়) হয়, যা বাযযার (রহিমাহুল্লাহ) সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফু হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন যে, সুখের বস্তু তিনটি : নেককার স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ি এবং স্বচ্ছন্দ বাহন। (- কাশফুল অসতার ২ : ১৫৬)। তবে এর সনদ শক্তিশালী নয়। কিন্তু মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থে সহীহ সনদে এই মর্মে আরও পূর্ণাঙ্গ হাদীস সংকলন করেছেন। এর শব্দসমূহ এরূপ : [আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদের সৌভাগ্যের (সুখের) বস্তু তিনটি। আর আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদের দুর্ভাগ্যের (দুঃখের) বস্তুও তিনটি। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদের সুখের বস্তু হচ্ছে সৎ স্ত্রী, যথাযোগ্য বাড়ি এবং যোগ্য বাহন। আর আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদের দুঃখের বস্তু হচ্ছে অসৎ স্ত্রী, অনুপযোগী বাড়ী এবং দুর্বল বাহন।] - [এই হাদীস আল্লামা আল হাইসামি (রহিমাহুল্লাহ) মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থের ৪ : ২৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে বলেন, এটি আহমাদ, বাযযার এবং তিরমিযি (রহিমাহুমুল্লাহ) স্বীয় 'আল-কাবীর' এবং 'আল-আওসাত' গ্রন্থে রিওয়ায়েত করেছেন। মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থের সনদ সহীহ।]

আর নবি ﷺ-এর ইরশাদ : "কোনো জিনিসের মধ্যে যদি বস্তুতঃভাবে অশুভ বলে কোনো কিছু থাকত, তাহলে ঘোড়া, স্ত্রী ও বাড়ির মধ্যে থাকত" **অর্থাৎ, যদি প্রকৃতপক্ষে কুলক্ষণ বলে কিছু থাকত,** তবে এই বস্তুগুলো

[৮৬] মিফতাহ দার আস-সা'আদাহ, ২/২৫৭।
http://islamport.com/w/qym/Web/3198/560.htm

থাকতা কেননা, এগুলোর কারণে অনেক সময় দুঃখে পতিত হতে হয়; যেমন- তথাকথিত কুলক্ষণে বিশ্বাসীরা দুঃখে সমাবৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুলক্ষণ প্রমাণিত নয়। তবে যেই ব্যক্তি নেককার স্ত্রী, যথাযোগ্য বাসস্থান এবং স্বচ্ছন্দ বাহন লাভ করে, সেই ব্যক্তি এই দুনিয়ায় সৌভাগ্যবান। আর যেই ব্যক্তি এই তিন বস্তুতে মন্দে সমাবৃত হয় সেই ব্যক্তি এই দুনিয়ায় দুর্ভাগা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বজ্ঞ।'[৮৭]

হাদীস বিশারদগণের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, এখানে নারী, গৃহ, ঘোড়া—এর কোনো বিষয়কেই পরমভাবে অশুভ বা অমঙ্গলজনক বলা হয়নি। নবি ﷺ থেকে বর্ণিত বহুসংখ্যক হাদীসে কোনো কিছুতে অশুভ প্রভাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বস্তুর মাঝে বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী ও প্রভাব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এটা তো সুবিদিত বিষয় যে, আদম (আলাইহিস সালাম) এর পুত্রদের অর্থাৎ পুরুষ জাতির জন্য সকল যুগেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আকর্ষণীয় ও পরম আকাঙ্ক্ষিত তিনটি বিষয় হচ্ছে নারী, বাসগৃহ এবং বাহন। সেই আদিম যুগ থেকে আজকের আধুনিক যুগ অবধি এই তিনটি জিনিসের জন্য পুরুষ জাতি বহু শ্রম সাধনা, অপরাধ এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত করেছে। আদিম যুগে যেমন উত্তম বাসগৃহ, ঘোড়া ও নারীর জন্য পুরুষ বহু কিছু করেছে, আজকের আধুনিক যুগের পুরুষেরও মানসপটে জাগরুক হয়ে থাকে একজন উত্তম জীবনসঙ্গিনী, দামী গাড়ি এবং বাড়ি। এই বিষয়গুলোর উত্তম প্রভাবে একজন পুরুষ যেমন সৌভাগ্যমণ্ডিত হতে পারে, খারাপ প্রভাবে একজন পুরুষের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে, অতি আকাঙ্ক্ষার জন্য অনেক অপরাধেও জড়িয়ে যেতে পারে। এখানে ভালো ও মন্দ উভয় প্রভাবই থাকতে পারে। বিভিন্ন হাদীসে নারী, বাসগৃহ এবং ঘোড়া তথা বাহনের উভয় রকমের প্রভাবের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। নারীকে অশুভ লক্ষণযুক্ত বলে ঘৃণিত হিসেবে দেখানো মোটেও হাদীসের উদ্দেশ্য নয়।

ইসলামে নারীকে যেভাবে গণ্য করা হয়েছে

দ্বীন ইসলামে বলা হয়েছে : মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

[৮৭] তাকমিলা, ৪ : ৩৮০-৩৮১।

> অর্থ : মুআবিয়া ইবনু জাহেমাহ সুলামী বলেন, একদা জাহেমাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবি ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি। তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমার মা আছে কি?' জাহেমাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাহলে **তুমি তার খিদমতে অবিচল থাকো। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।'**[৮৮]

ইসলামে নারী জাতি যদি সত্যিই অশুভ এক জীব হতো, তাহলে কী করে মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত হয়? অশুভ বা অমঙ্গলজনক কারও পায়ের নিচে কি জান্নাত হতে পারে? যার পায়ের নিচে জান্নাত, তার থেকে মহান মর্যাদা আর কার হতে পারে?

যে আরবে একসময় কন্যাসন্তানদেরকে অশুভ ও লজ্জার বিষয় মনে করে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, ইসলাম তা চিরতরে বন্ধ করেছে।

> '...আর তিনি (নবি ﷺ) **মায়েদের অবাধ্য হতে, কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে** ও প্রাপকের পাওনা দেয়া থেকে হাত গুটাতে আর নেয়ার ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দিতে **নিষেধ করতেন।** আবূ আবদুল্লাহ [বুখারি (রহিমাহুল্লাহ)] বলেন, **তারা (কাফির) জাহিলিয়্যাতের যুগে স্বীয় কন্যাদেরকে হত্যা করত।** অতঃপর **আল্লাহ তা হারাম করে দেন।'**[৮৯]

ইসলাম শুধু জীবন্ত কন্যা সন্তান কবর দেয়া বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি; কন্যাসন্তানকে উত্তমভাবে প্রতিপালন করবার আদেশ দিয়েছে এবং একে তার পিতামাতার জান্নাতে যাবার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এমনকি ভাইয়ের জন্য বোনের সাথে মমতাপূর্ণ আচরণ করাকেও জান্নাতে যাবার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কন্যাসন্তান উত্তমভাবে প্রতিপালন সম্পর্কে অনেক সাহাবি থেকে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত রয়েছে, যার সবগুলো উল্লেখ করলে আমাদের প্রবন্ধের কলেবর বিশাল হয়ে যেতে পারে। আমরা উদাহরণ হিসেবে ইমাম বুখারি (রহিমাহুল্লাহ) এর আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থ থেকে ৭৬ থেকে ৭৯নং হাদীস উল্লেখ করছি। এর প্রতিটি হাদীস-ই সহীহ।

উকবা ইবনু আমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে

---

[৮৮] আহমাদ, ১৫৫৩৮; নাসায়ী, ৩১০৪; ইবনু মাজাহ, ২৭৮১; বাইহাকি, ১৮২৮৮; হাকিম, ২৫০২. সহীহ।
https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=65463

[৮৯] বুখারি, ৭২৯২, সহীহ।
https://www.hadithbd.com/hadith/error/?id=32137

শুনেছি :

> যার তিনটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকাদি দেয়, তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী প্রতিবন্ধক হবে।'[৯০]

ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। নবি ﷺ বলেন,

> 'যে মুসলিমের **দুইটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদেরকে উত্তম সাহচর্য দান করে, তারা তাকে জান্নাতে দাখিল করবে।**'[৯১]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> **'যার তিনটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।'** লোকজনের মধ্য থেকে একজন বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, **কারও যদি দুটি কন্যাসন্তান থাকে?'** তিনি বলেন, **'দুইটি কন্যাসন্তান হলেও।'**[৯২]

আবূ সাঈদ খুদরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> **'যে ব্যক্তির তিনটি কন্যাসন্তান বা তিনটি বোন আছে এবং সে তাদের সাথে মমতাপূর্ণ ব্যবহার করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'**[৯৩][৯৪]

অশুভ বা অমঙ্গলজনক কেউ কি জান্নাতে যাবার কারণ হতে পারে? ইসলামে নারীকে যদি অশুভ জীব হিসেবেই গণ্য করা হতো, তাহলে কি কন্যাসন্তানকে এভাবে উত্তমভাবে প্রতিপালনের আদেশ দেয়া হতো বা একে জান্নাতে যাবার কারণ বলা হতো? জান্নাতে যাবার কারণের চেয়ে মঙ্গলজনক আর কিছু কি হতে পারে? প্রিয় পাঠক, লক্ষ করুন। যে ইসলাম জাহিলি আরবের বর্বর রীতিনীতিকে উৎখাত করে কন্যাসন্তানের প্রতি সদাচরণের আদেশ দিয়েছে এবং একে জান্নাতে যাবার কারণ বানিয়েছে, নাস্তিক-মুক্তমনারা সেই ইসলামকেই নারীবিদ্বেষী এক ধর্ম হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা করছে।

ইসলাম মুমিন পুরুষদেরকে আদেশ করেছে মুমিন নারীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ না রাখতে। তাকে অশুভ বা অপয়া মনে করে ঘৃণিত বানিয়ে রাখবার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

---

[৯০] মুসনাদু আহমাদ, ১৭৪০৩; ইবনু মাজাহ, ৩৬৬৯।
[৯১] তিরমিযি, ১৯১৭; ইবনু মাজাহ, ৩৬৭০।
[৯২] মুসনাদু আহমাদ, ১৪২৪৭; শুআবুল ঈমান, ৮৩১৬; তাবারানি, ৪৭৬০।
[৯৩] তিরমিযি, ১৯১২; সুনানু আবী দাউদ, ৫১৪৭।
[৯৪] আল আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারি।
https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=20§ion=486

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»

> অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কোনো মুমিন যেন মুমিনাহ-কে ঘৃণা না করে (বা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ না করে); যদি তার কোনো আচরণে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে অন্য আর এক আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্টি লাভ করবে।'[৯৫]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায়[৯৬] বলা হয়েছে,

'নবি ﷺ-এর বাণী : (لَا يَفْرَكْ) শেষ অক্ষর সাকীন বা জযম কিংবা পেশ উভয় যোগে পাঠ সিদ্ধ। (ر) বর্ণটি যবর-যোগে পঠিত হয়; আভিধানিক অর্থ- মর্দন করা, দলিত করা। মুল্লা আলি কারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (فَرْكٌ) শব্দটি بُغْضٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপছন্দ ইত্যাদি। **হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিনাহ নারীকে অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। কোনো বিষয়েই ঘৃণা বা অবজ্ঞা করবে না,** কারণ তার মধ্যে অন্য যে গুণটি রয়েছে তাতে সে খুশি হবে। একজন মানুষ হিসেবে সকল গুণ তার মধ্যে থাকতে পারে না।

কাযী ইয়ায বলেন, (لَا يَفْرَكْ) এটা নাফি বা না-বাচক কর্ম; কিন্তু অর্থ প্রদান করেছে নাহি বা নিষেধাজ্ঞাবাচক কর্মের। এর অর্থ হয়েছে **স্ত্রীর অপছন্দনীয় কিছু দেখে তাকে অবজ্ঞা অথবা ঘৃণা করা কোনো পুরুষের জন্য উচিত নয়।** কেননা, একটি বিষয় সে অপছন্দ করছে, অন্যটি সে অবশ্যই পছন্দ করবে এবং তাতে খুশি হবে। **এই ভালো গুণটি দিয়ে সে খারাপটির মোকাবিলা করবে।** এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দোষ ছাড়া কোনো মানুষই পাওয়া যায় না, কেউ যদি দোষ ছাড়া কোনো মানুষ খুঁজতে যায় তাহলে সে সাথিহীন একাই পড়ে থাকবে।

এতে আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সকল মানুষই বিশেষ করে মুমিনের মধ্যে কতিপয় উত্তম ও প্রশংসিত স্বভাব বা গুণাবলী রয়েছে, এই উত্তম আচরণ ও গুণাবলীকে বিবেচনায় আনবে, আর **অন্য খারাপ স্বভাবগুলো ঢেকে রাখবে এবং এড়িয়ে চলবে।**'[৯৭]

অশুভ ও অমঙ্গলজনক হিসেবে গণ্য করা তো দূরের বস্তু, ইসলামে একজন সচ্চরিত্রবান নারীকে পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ বলা হয়েছে।

---

[৯৫] মুসলিম, ১৪৬৯, সহীহ; আহমাদ, ৮৩৬৩; সহীহ আত-তারগীব, ১৯২৮; সহীহ আল জামি, ৭৭৬১। https://www.hadithbd.net/hadith/link/?id=68565

[৯৬] হাদীসের ব্যাখ্যার উৎস : তাহকীক মিশকাতুল মাসাবিহ (হাদীস একাডেমি), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০১।

[৯৭] শারহে মুসলিম, ৯/১০ খণ্ড, ১৪৬৯; মুসনাদু আহমাদ, ২য় খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ; মিরকাতুল মাফাতীহ।

> 'সম্পূর্ণ পৃথিবী সম্পদ; আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী।'[১৮]

উপসংহার

আমরা আশা করছি, এই আলোচনার দ্বারা সকলের নিকট এটি স্পষ্ট হয়েছে ইসলামে নারীকে অশুভ ও অমঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করা হয় না। 'শুধু নারী হবার জন্য ইসলাম একজন মানুষকে ঘৃণা করতে বলে'—এমন বিকৃত ধারণা শুধুমাত্র ইসলামবিরোধীদের অপব্যাখ্যার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। বরং ইসলাম জাহিলি যুগের অন্ধকারকে ছিন্ন করে নারীকে সুমহান মর্যাদা দান করেছে। একজন সচ্চরিত্রবান নারীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অভিহীত করেছে।

[১৮] বুখারি, মুসলিম, মিশকাত, ৩০৮৩; সহ

হাদীসে কি নারীদেরকে ভোগ্যপণ্য বলা হয়েছে?

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

নাস্তিকদের দাবি

‘নারীকে ভোগ্যপণ্য বলেছেন নবী। নবী মুহাম্মদ বলেছেন, নারী হচ্ছে এক উপভোগ্য উপকরণ বা ভোগ্য পণ্য। নারীর সৃষ্টি যদি পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য হয় থাকে, তা অবশ্যই নারীকে একটি স্বাধীন এবং স্বাভাবিক সত্ত্বা হিসেবে চিহ্নিত কর না, বরঞ্চ পুরুষের জন্য একটি উপভোগ্য বস্তু হিসেবে নির্দেশ করে, একটি যৌনব হিসেবে চিহ্নিত করে।’ (বাংলাদেশি নাস্তিকদের একটি অন্যতম প্রধান ব্লগ থেকে উদ্ধৃত)

জবাব

ইসলামবিরোধীরা একটি হাদীস দেখিয়ে দাবি করে নবি মুহাম্মাদ ﷺ না কি নারীদেরকে ভোগ্যপণ্য বলতেন! হাদীসটি হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ"

> অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।[৯৯]

[৯৯] মুসলিম, ৩৫১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=13123

নাস্তিকদের বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুক লাইভে এই হাদীস উল্লেখ করে লাগাতার এই দাবি করা হয়- ইসলামে নারী শুধু 'ভোগ্যপণ্য', ইসলামে নারী শুধুমাত্র পুরুষের 'যৌনযন্ত্র' (নাউযুবিল্লাহ)।

তাদের এহেন দাবির জবাবে আমরা যা বলব

প্রথমত,

হাদীসের সরল অনুবাদেই এটা দেখা যাচ্ছে যে, এখানে পুণ্যবতী নারীকে উত্তম বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।' অর্থাৎ, এই অনুবাদ থেকেও এটি বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে নারীর পুণ্যময়তাকে তথা নারীর গুণকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। নারীকে শুধুই "ভোগ্যবস্তু" বা "যৌনযন্ত্র" বলা যদি হাদীসের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে নারীর গুণকে মূল্যায়ন করা হতো না। বরং নারীর শারীরিক সৌন্দর্য বা এই জাতীয় বিষয়াদীর দিকে ইঙ্গিত করা হতো। তা না করে এখানে নারীর পুণ্যময়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাদীস থেকে নারীকে পুরুষের 'যৌনযন্ত্র' বোঝানো হয়েছে - এমন ব্যাখ্যার জন্য অনেক বড় মাপের কল্পনাবিলাসী হওয়া প্রয়োজন। স্বাভাবিক মানুষ এমন বাজে কল্পনা করে না। তবে নাস্তিক-মুক্তমনাদের থেকে এমন কল্পনা আসা অস্বাভাবিক কিছু নয় বৈকি!

দ্বিতীয়ত,

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে অনূদিত মুসলিমে শরিফে আলোচ্য হাদীসে مَتَاعٌ (মাতা') শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য)'। مَتَاعٌ (মাতা') শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয় তা আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

وكل منافع الدنيا متاع . قال أبو جعفر النحاس : وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين ، وهو موافق للغة . والمتاع في كلام العرب : المنفعة ؛ ومنه أمتع الله بك . ومنه فمتعوهن .

অর্থ : পৃথিবীতে উপকারী যেকোনো কিছুই 'মাতা' (متاع)। আবু জাফর নাহহাস [প্রখ্যাত মিসরীয় ব্যাকরণবিদ] বলেছেন, এটিই মুসলিম উম্মাহর ইমামদের মধ্য থেকে একজন ইমাম প্রদত্ত উত্তম ব্যাখ্যা। এটিই (আরবি) ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরবিভাষীদের কথামালায় 'মাতা' (متاع) এর মানে হলো, 'উপকারী জিনিস'। উদাহরণ : 'আল্লাহ তোমাকে উপকৃত/সুখী করুন।' আরও একটি উদাহরণ : 'তোমরা তাদের উপকার করো।'[১০০]

[১০০] তাফসীর কুরতুবী, সূরা নূরের ২৯ নং আয়াতের তাফসীর। https://bit.ly/3dzBkda

আমরা আরবি ভাষায় শব্দটির ব্যবহার দেখলাম। যা থেকে উপকার লাভ করা যায়, আরবি ভাষায় সেটিই হচ্ছে مَتَاعٌ (মাতা')। হাদীসে বোঝানো হয়েছে, একজন পুণ্যবতী নারী হচ্ছেন এমন একজন যার থেকে পৃথিবীতে সব থেকে বেশি উপকার লাভ করা যায়।

তৃতীয়ত,

হাদীসে পুরো পৃথিবীকেই 'মাতা' (متاع) বলা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছুই এর মাঝে শামিল।[১০১] হাদীসের মাকসাদ যদি এমনই হতো যে, নারীকে আলাদা করে একটা 'ভোগ্যপণ্য' বলা হবে, তাহলে পুরো দুনিয়ার (الدنيا) কথা বলা হতো না। এখানে হাদীসে পুরো পৃথিবীকেই উপকারের আধার (الدنيا متاع) বলা হয়েছে আর এর মাঝে সব থেকে উপকারী হচ্ছে পুণ্যবতী নারী, সে কথাটি বোঝানো হচ্ছে। এ হাদীসটিতে মোটেও নারীজাতিকে তুচ্ছ করার উদ্দেশ্য নেই; বরং পুণ্যবতী নারীর গুণকেই মূল্যায়ন করা হচ্ছে। যে হাদীসে নারীজাতির গুণকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, সেই হাদীসকে উলটো নারীর প্রতি অবমাননাকর বলে উল্লেখ করে নাস্তিক-মুক্তমনারা। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগগুলোর আসল অবস্থা কীরূপ।

চতুর্থত,

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها ، وعقلها : فهذا خيرُ متاع الدنيا ؛ لأنها تحفظه في سره ، وماله ، وولده ، وإذا كانت صالحة في العقل أيضاً : فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته ، وفي تربية أولادها ، إنْ نظر إليها : سرَّته ، وإن غاب عنها : حفظته ، وإن وَكل إليها أمرَه : لم تخنه ، فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وحسبها ، وجمالها ، ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك) يعني : عليك بها ؛ فإنها خير من يتزوجه الإنسان ، فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة : لكن يجمِّلها خلُقها ، ودِينُها .

অর্থ : কারও যদি দ্বীন এবং আকলের দিক থেকে একজন পুণ্যবতী স্ত্রী থাকে, তাহলে তা হবে পৃথিবীর সব থেকে উত্তম সম্পদ। কারণ, সে তার

[১০১] http://tiny.cc/q670tz

গোপনীয়তা রক্ষা করে, তার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে হিফাযত করে। সে যদি বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকেও পুণ্যবতী হয়, তাহলে সে তার গৃহের উত্তম ব্যাবস্থাপনা ও সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে। স্বামী তার দিকে তাঁকালে তাকে আনন্দিত করে, আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে (সন্তান, সম্পদ, ও আমানত ইত্যাদি) হিফাযত করে। তাকে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হলে এর খিয়ানত করে না। এমন নারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ জন্যই নবি ﷺ বলেছেন, 'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়; তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। সুতরাং, **তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে,** নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (বুখারি, ৫০৯০) এর মানে হলো, তোমাকে এটি (দ্বীনদারীকে প্রাধান্য প্রদান) করতেই হবে। এমন নারীই বিবাহের জন্য সব থেকে উত্তম। **তার চেহারা যদি সুন্দর না-ও হয়ে থাকে, তার চরিত্র এবং দ্বীন তাকে (প্রকৃত) সুন্দর করে তোলে।**[১০২]

এখানে অন্য একটি হাদীসের সাহায্যে আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, নারীর সৌন্দর্যের থেকেও তার দ্বীনদারী বড়। একজন নারী যদি চেহারার দিক থেকে সুন্দরী না-ও হয়ে থাকেন, তাঁর গুণাবলীই তাঁকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। জীবনসঙ্গিনী হিসাবে এমন নারীকেই বেছে নিতে বলা হয়েছে। আমরা এখানে লক্ষ করলাম যে, নারীর দৈহিক সৌন্দর্য নয় বরং তাঁর কর্মকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে হাদীস বিশারদদের ব্যাখ্যা। যে হাদীসে এভাবে একজন নারীকে মূল্যায়ন করা হয়েছে, সেই হাদীস থেকেই নাস্তিক-মুক্তমনারা বুঝেছেন নারীরা "যৌনযন্ত্র", "পুরুষের ভোগ্যপণ্য" ইত্যাদি।

আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিন।

পঞ্চমত,

নাস্তিক-মুক্তমনারা এরপরেও হয়তো দাবি করবেন, তারা তো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন, আর সেখানে তো 'ভোগ্যপণ্য'ই বলা আছে!

এর জবাবে আমরা বলব, অনুবাদটি ভালো করে খেয়াল করে দেখুন। এমনকি ঐ অনুবাদেও নারীকে 'ভোগ্যপণ্য' বলা হয়নি বরং দুনিয়াকে 'ভোগ্যপণ্য' বলা

[১০২] শারহু রিয়াদুস সলিহীন, ২/১২৭-১২৮।
https://islamqa.info/ar/109190/

হয়েছে। সে অনুবাদে বলা হয়েছে,

> 'দুনিয়া উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।'

দুনিয়ার ক্ষেত্রে যে শব্দটি ব্রাকেট দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, নারীর ক্ষেত্রে সেটি উল্লেখ করা হয়নি। আমরা জানি যে কর্তাভেদে শব্দের ভিন্ন প্রয়োগ ঘটে। দুনিয়া একটি জড়বস্তু, নারী জড়বস্তু নয়। অনুবাদ করতে গিয়ে দুনিয়ার ক্ষেত্রে যে বিশেষণটি ব্রাকেট দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, নারীর ক্ষেত্রে সেটি উল্লেখ হয়নি। অথচ নাস্তিক-মুক্তমনারা অবলীলায় দুনিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিশেষণটি নারীর ওপর লাগিয়ে দিয়ে নবি ﷺ-এর বদনাম করলেন!

আমরা এই দাবি করছি না যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ভুল। 'মাতা' (متاع) শব্দের অর্থ করতে গিয়ে সেখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোও ঐ শব্দের সঠিক অনুবাদ। কিন্তু আমরা এটিও মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সব সময়ে হাদীসের একটিমাত্র অনুবাদ দেখেই আকীদা বা মাসআলা নেওয়া যায় না, হাদীসের মূলভাব বোঝা যায় না (আর যে মূলভাব বোঝা যায়, তাকেও অনেক সময়ে নাস্তিক-মুক্তমনারা অপব্যাখ্যা করেন, তিলকে তাল বানান)। আমরা একটু আগেই দেখেছি আলোচ্য হাদীসে ভাষাগতভাবে ঐ শব্দের অর্থ কীরূপ হয়। আমরা আরও দেখেছি, একজন হাদীস বিশারদ কীভাবে অন্য হাদীসের সাহায্যে আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন, ঐ হাদীসে একজন নারীর সৌন্দর্যের চেয়েও তার দ্বীনকে, তাঁর গুণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীকে মোটেও 'যৌনযন্ত্র', 'ভোগ করার পণ্য' এইসব বোঝানো হয়নি। হাদীসের একটি অনুবাদ মানে একজন অনুবাদকের নিজস্ব বুঝ। আমরা ঐ একই হাদীসের আরও কয়েকটি অনুবাদ দেখতে পারি।

প্রসিদ্ধ হাদীস ওয়েবসাইট sunnah.com-এ *সহীহ মুসলিমে* হাদীসটির এই অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে,

> **'The whole world is a <u>provision</u>, and the best <u>object of benefit</u> of the world is the pious woman.'**[১০৩]

এখানে 'মাতা' (متاع) শব্দের অনুবাদে একবার Provision (সংস্থান) এবং আরেকবার Object of Benefit (এমন জিনিস যা থেকে উপকার লাভ করা যায়) বলা হয়েছে। 'ভোগ্যপণ্য' বলা হয়নি।

হাদীসগ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে এদেশের উল্লেখযোগ্য একটি প্রকাশনা সংস্থা 'বাংলাদেশ

---

[১০৩] https://sunnah.com/muslim/17/76

ইসলামিক সেন্টার' এর সহীহ মুসলিম অনুবাদে হাদীসটি এভাবে আছে—

> আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, **'দুনিয়ায় সবকিছুই সম্পদ। তবে দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে উত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী।'**[১০৪]

নাস্তিক-মুক্তমনাদেরকে প্রায়শই প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন শাইখ আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফের (হাফিযাহুল্লাহ) বিভিন্ন বক্তব্যকে উদ্ধৃত করতে দেখা যায়। [যদিও তারা এটি করে ইসলামকে হেয় করার উদ্দেশে] শাইখ আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর 'উপদেশ' বইতে এই হাদীসকে এভাবে অনুবাদ করেছেন—

> 'সম্পূর্ণ পৃথিবী **সম্পদ।** আর পৃথিবীর **সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী।'**[১০৫][১০৬]

তিনি এখানে অনুবাদ করেছেন 'সম্পদ'। অর্থাৎ একজন পুণ্যবতী নারী হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই অনুবাদে 'ভোগ্যপণ্য' নেই।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত শরিফ) অনুবাদেও সহীহ মুসলিমের এই হাদীসটি রয়েছে। সেখানে এর অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে,

> আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **'দুনিয়ার সমস্ত কিছুই (তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী) ধনসম্পদ। (তন্মধ্যে) <u>মুসলিম সতীসাধ্বী রমণী সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।</u>'**[১০৭]

প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর সুবিখ্যাত 'মাসিক আত-তাহরীক' পত্রিকায় আলোচ্য হাদীসের অনুবাদ এভাবে করেছেন,

> 'দুনিয়াটাই **সম্পদ।** যার **সেরা সম্পদ হলো পূণ্যশীলা স্ত্রী।'**[১০৮]

এখানে আমরা বাংলায় আরও একটি অনুবাদে দেখলাম 'ভোগ্যপণ্য', 'উপভোগের উপকরণ' এমন কোনো শব্দ নেই। বরং এখানে পূন্যশীলা স্ত্রীকে সেরা সম্পদ বলা হয়েছে। অধিকাংশ বাংলা অনুবাদেই এখানে পূণ্যবতী নারীকে পৃথিবীর সেরা সম্পদ বলে অর্থ করা হয়েছে। একজন নারীকে কী পরিমাণ মর্যাদা দিয়ে ও কদর

[১০৪] সহীহ মুসলিম (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার) খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩০।
[১০৫] বুখারি, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩।
[১০৬] উপদেশ – আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৪৭।
[১০৭] মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত), ৩০৮৩। https://www.hadithbd.com/hadith/email/?id=68410
[১০৮] প্রবন্ধ : 'উত্তম পরিবার'; 'মাসিক আত-তাহরীক' (জুলাই ২০১৪) – ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব; https://at-tahreek.com/article_details/5580

করে 'সম্পদ' বলে অভিহীত করা হয়, এর উদাহরণ বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পের বিখ্যাত একটা লাইন উল্লেখ করছি—

> 'কিন্তু, সে যে **আমার সাধনার ধন** ছিল; **সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।**'[১০৯]

আলোচ্য হাদীসেও এভাবে পুণ্যবতী নারীর কদর করা হয়েছে। ওপরের ব্যাকরণগত আলোচনা, অনেকগুলো বাংলা অনুবাদের উদাহরণ থেকে এটি পরিষ্কার যে, হাদীসের মূলভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র নাস্তিক-মুক্তমনারা উপস্থাপন করেছে। এমনকি যে অনুবাদটি তারা উল্লেখ করে, সেটিকেও তারা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। এতগুলো অনুবাদের বিপরীতে গিয়ে এরপরেও যদি নাস্তিক-মুক্তমনারা একটি অনুবাদকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এই দাবি করতে চায় যে, ইসলামে নারীকে 'ভোগ্যপণ্য' বলা হয়েছে—তাহলে এটি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অসারতাকেই প্রমাণ করবে।

ষষ্ঠত,

এই হাদীসের কথা যদি বাদও দেওয়া হয়, ইসলামে নারীদেরকে কি পুরুষের ভোগ্যপণ্য বলা হয়েছে? না কি অন্য কিছু বলা হয়েছে?

কুরআনে বলা হয়েছে,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> **'মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু,** তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান।'[১১০]

ভোগ্যপণ্য তো দূরের বস্তু, কুরআনে মুমিন পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের বন্ধু বলা হয়েছে। প্রিয় পাঠক, বাস্তবতার সাথে নাস্তিক-মুক্তমনাদের ইসলামবিরোধী

---

[১০৯] হৈমন্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/2694
https://bn.wikisource.org/wiki/গল্পগুচ্ছ/হৈমন্তী

[১১০] সূরা তাওবা, ৯ : ৭১।
https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=1306

অপপ্রচারগুলোর একটু তুলনা করে দেখুন।

সহীহ বুখারির একটি হাদীসে উল্লেখ আছে,

> '...উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) আরও বললেন, আল্লাহর কসম! জাহিলি যুগে নারীদের কোনো অধিকার আছে বলে আমরা মনে করতাম না। অবশেষে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে যে বিধান নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন এবং তাদের হক হিসেবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন...।'[১১১]

ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগে নারীদের অধিকার বলতে কোনো কিছু ছিল না। আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করে নারীদের হক (অধিকার) প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগে নারীরা আক্ষরিকভাবেই পণ্যদ্রব্যের মতো ছিল। পিতার স্ত্রী অর্থাৎ মা পর্যন্ত তাদের কাছে পণ্যের মতো ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে অন্য পণ্যদ্রব্যের মতো বাবার নিকট থেকে তারা তার স্ত্রী অর্থাৎ মায়েরও মালিকানা লাভ করত! জাহিলিয়াতের যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা বিনা দ্বিধায় বিয়ে করে নিত। [দেখুন- বুখারি, ৪৫৭৯] আল্লাহ তাআলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলে অভিহিত করেছেন।[১১২] নারীর পণ্যায়নের এই অশ্লীল রীতিকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ নাযিল করেছেন,

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

> নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে কোরো না, তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (সেটা ক্ষমা করা হলো); নিশ্চয়ই তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা।'[১১৩]

পরিশেষে বলব, যে ইসলাম নারীকে পণ্যদ্রব্যের মতো অবস্থা থেকে মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করেছে, সেই ইসলামের নামেই এখন উলটো নারীকে পণ্য বানানোর অপবাদ দিচ্ছে নাস্তিক-মুক্তমনারা। তারা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যে চিত্র উপস্থাপন করে তা খণ্ডিত, অপব্যাখ্যায় পূর্ণ এবং প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরের কোনো চিত্র। আমরা আল্লাহর নিকট তাদের সংশোধন এবং হিদায়াত কামনা করি।

---

[১১১] বুখারি, ৪৫৪৮।
https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=4854
[১১২] তাফসীর যাকারিয়া, সূরা নিসার ২২ নং আয়াতের তাফসীর।
https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=515
[১১৩] সূরা নিসা, ৪ : ২২।

সাত হারফ কি কুরআনের একাধিক ভার্সন?

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

অনেকেই সাবআতুল আহরুফ বা কুরআনের ৭ হারফ নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন এবং অভিযোগ করে থাকেন এটা নাকি কুরআনের বিভিন্ন ভার্সন বা সংস্করণ (নাউযুবিল্লাহ)। অনেক সময়ে খ্রিষ্টান মিশনারী কিংবা নাস্তিক মুক্তমনারা বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত প্রাচীন কুরআনের কপির কথা প্রচার করেন, যেগুলোতে কিছু শব্দ ও বাক্য বর্তমানে প্রচলিত কুরআনের থেকে কিছুটা ভিন্ন। এভাবে তারা কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তারা বলতে চান যে, কুরআন ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি এবং সাহাবিগণ কুরআনকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)! আসুন, এইসব অভিযোগের স্বরূপ সন্ধানে যাওয়া যাক।

হারফ বহুবচনে আহরুফ (حرف ج. أحرف) অর্থ কিনারা, তট, কূলভূমি ইত্যাদি।[১১৪]

যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

'কিছু কিছু মানুষ আছে যারা দ্বিধার (প্রান্তে দাঁড়িয়ে) আল্লাহর ইবাদাত করে।'[১১৫]

সাত হারফে কুরআন নাযিলের বিষয়টি অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

[১১৪] Arabic-English Dictionary for Quranic Usage, p-201; কুরআনের অর্থ বুঝার সহজ অভিধান, আবদুল হালীম, পৃ-৬৫ (IslamHouse.com.bd)

[১১৫] সূরা হাজ্জ, ২২ : ১১।

'জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং পুনঃপুনঃ অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য পাঠ পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত হারফে তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন।'[১১৬]

কুরআনের এই ৭ হারফ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত।

এই সাত আহরুফ বা হারফসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উলামারা অনেক আগে থেকেই এই সাত হারফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত সম্পর্কে শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন,

أحسن الأقوال مما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تختلف باللفظ وقد تتفق بالمعنى وإن اختلفت بالمعنى: فاختلافها من باب التنوع والتغاير لا من باب التضاد والتعارض

'এই বিষয়ে উলামাদের থেকে বর্ণিত সর্বাধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে, এই সাবআতুল আহরুফ কিরাতের সাতটি বিশেষ পদ্ধতি যা শব্দের দিক থেকে আলাদা হলেও অর্থের দিক থেকে এক। আর যদি ও অর্থের দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্নও হয়, তবে তা বৈচিত্র্যের দিক থেকে **সামগ্রিকভাবে** একে অপরের বিরোধী নয়।'[১১৭]

আমরা কুরআনের হারফ সাতটির সামান্য পরিচয় জানব ও এই সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ দেখে নেব।

কুরআনে হারফ সাতভাবে ভিন্ন হতে পারে—

১. ভিন্ন শব্দে একই অর্থ প্রকাশ,
২. শব্দ ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য হওয়া,
৩. শব্দের যোজন-বিয়োজনে অর্থের অভিন্নতা,
৪. শব্দে আগ-পিছ হওয়া ও অর্থের অভিন্নতা,
৫. ইরাবের ভিন্নতা ও অর্থের অভিন্নতা,

[১১৬] সহীহ বুখারি, (ইফা), ফাযায়িলুল কুরআন, ৮/৩৪০, হা-৪৬২৫।
[১১৭] https://islamqa.info/ar/5142

৬. ওয়াক্বফে ভিন্নতা ও
৭. উচ্চারণে ভিন্নতা।

১. ভিন্ন শব্দে একই অর্থ প্রকাশ :

সাত হারফের প্রকারভেদের একটি হলো, ভিন্ন শব্দ তবে একই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ **فَتَبَيَّنُوا** أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

> 'হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।'[১১৮]

এটি হচ্ছে এই আয়াতের আমাদের পরিচিত কিরাতের ইবারাত (মূল টেক্সট)। ওপরে মোটা অক্ষরে আন্ডারলাইন করা শব্দটি হলো, ফাতাবাইইয়ানু (فَتَبَيَّنُوا), যার অর্থ হলো পরীক্ষা করে দেখবে (ফেলে আমর)। কিন্তু অন্যান্য কিছু কিরাতে এই ফাতাবাইইয়ানু (فَتَبَيَّنُوا) শব্দটির স্থলে এসেছে ফাতাছাব্বাতু (فتثبتوا)।

অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাত : (إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)

ভিন্ন কিরাত : (إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتثبتوا)

ফাতাবাইইয়ানু (فَتَبَيَّنُوا) ও ফাতাছাব্বাতু (فتثبتوا) এই দুটি শব্দের অর্থই এক; তা হলো পরীক্ষা করে দেখা, প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, আরবরা নুকতা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল না, তাই আমরা যদি ফাতাবাইইয়ানু ও ফাতাছাব্বাতু শব্দ দুইটিকে নুকতা ছাড়াই দেখি তবে দুটি শব্দই একই রকম।

২. শব্দে ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য হওয়া :

সাত হারফের মধ্যে ২য় হলো যেখানে শব্দ ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

'আপনি যখন সেখানে বিশাল নিয়ামাতরাজি ও সাম্রাজ্য দেখতে পাবেন।'[১১৯]

এখানে মূলক (مُلْكً) অর্থ সাম্রাজ্য। তবে কিছু কিছু কিরাতে এসেছে আয়াতের মূলক (مُلْكً) শব্দের পরিবর্তে মালিক (مالك) অর্থাৎ, সম্রাট শব্দ এসেছে। অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাত : وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

অনুবাদ : আপনি যখন সেখানে বিশাল নিয়ামাতরাজি ও সাম্রাজ্য দেখতে পাবেন।

ভিন্ন কিরাত : وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمالكا كَبِيرًا

অনুবাদ : আপনি যখন সেখানে বিশাল নিয়ামাতরাজি ও মহান সম্রাটকে দেখতে পাবেন।

দুটি শব্দ পরিপূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। তবে সত্য কথা হলো, এতে অর্থের পরিবর্তন মোটেও দোষনীয় নয়। কেননা মূলক বা সাম্রাজ্য দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হচ্ছে আর মালিক দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হচ্ছে। মালিককে দেখা বলতে আল্লাহর দর্শনকে বুঝানো হচ্ছে। দুটি শব্দের অর্থই ইসলামি আকীদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই অর্থের ভিন্নতা এখানে মোটেই সমস্যার কারণ নয়।

৩. শব্দে যোজন-বিয়োজন তবে অর্থের অভিন্নতা :

কখনো কখনো শব্দে যোজন বা বিয়োজনের কারণে পার্থক্য ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন

[১১৯] সূরা ইনসান, ৭৬ : ২০।

> কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা।'[১২০]

আমরা কুরআনে অন্যান্য অনেক স্থানেই জান্নাতের নদীর বর্ণনায় 'তাজরী মিন তাহতিহাল আনহা'র উল্লেখ পাই; শুধু এই আয়াতটি ছাড়া যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতের নদীর বর্ণনায় 'তাজরী তাহতিহাল আনহার (تَجۡرِی تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ)' ব্যবহার করেছেন। তবে অন্য কিছু কিরাতে এই স্থলেও তাজরী মিন তাহতিহাল আনহার (تَجۡرِی من تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَـٰر) এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাতে : وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّـٰتٍ تَجۡرِی تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَـٰر

ভিন্ন কিরাতে : وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّـٰتٍ تَجۡرِی من تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَـٰر

এই দুই কিরাতেই আয়াতের অর্থের সামান্যও পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শব্দের হয় যোজন অথবা বিয়োজন ঘটে থাকে।

৪. শব্দের আগ-পিছ হয়ে থাকে এবং অর্থ অপরিবর্তিত থাকে :

এই ক্ষেত্রে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—

ক. আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

> 'আল্লাহ মুসলিমদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।'[১২১]

এখানে মোটা অক্ষরে ও আন্ডারলাইন করা দুটি শব্দ দেখতে পাচ্ছি যা হলো ফাইয়াকতুলুনা ওয়া ইয়ুকতালুন (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) অর্থাৎ, তারা মারে ও মরে। তবে অন্য কিছু কিরাতে এই দুটি শব্দ আগে-পিছে হয়েছে। অর্থাৎ, ফাইয়ুকতালুনা ওয়া ইয়াকতুলুন (তারা মরে ও মারে)।

অর্থাৎ, পরিচিত কিরাত : يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

ভিন্ন কিরাত : يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فيقتلونِ فيقتلون

৫. ইরাবে মতপার্থক্য ও অর্থে অভিন্নতা :

ইরাব বলতে আরবি শব্দের শেষের হারাকাত নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বোঝায়। ইরাব তিন প্রকার যথা মারফু, মানসুব ও মাজরুর। এর উদাহরণ নিম্নরূপ—

আল্লাহ বলেন,

اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

> ‘তিনি আল্লাহ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবকিছুর মালিক৷ কাফিরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব৷’[১২২]

আন্ডারলাইন করা অংশটি আল্লাহি (ٱللَّهِ) ‘আল্লাহ’ শব্দটির সঙ্গে ছোট হা এর নিচে কাসরাহ বা যের হয়ে আল্লাহি হয়েছে অর্থাৎ, এই শব্দটি মাজরুর অবস্থায় আছে। তবে কিছু কিছু কিরাতে এখানে আল্লাহি (ٱللَّهِ) এর স্থলে দাম্মাহ (পেশ) দ্বারা মারফুভাবে আল্লাহু (ٱللَّهُ) ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাতে : ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ

ভিন্ন কিরাতে : ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ

অর্থে কোনো ভিন্নতা হয়নি।

[১২২] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২।

৬. ওয়াককে মতপার্থক্য :

ওয়াকফ বলতে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে থামার নির্দেশকে বোঝায়। বিভিন্ন কিরাতে এই ওয়াককে মতপার্থক্য হয়েছে। যেমন,

আল্লাহ বলেন,

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

> 'বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন; তিনি সব মেহেরবানদের চাইতে অধিক মেহেরবান।'[১২৩]

এই আয়াতে আমাদের পরিচিত কিরাতে ওয়াকফ হবে (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) এর পরে। তবে কিছু কিরায়তে ওয়াকফ করা হয়েছে (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ) এর পরে।

অর্থাৎ,

পরিচিত কিরাতে : (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ)

ভিন্ন কিরাতে : (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ۝ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আলাইকুম (عَلَيْكُمْ) শব্দটির পরে ওয়াকফ হয়েছে আর আল-ইয়াওমা (الْيَوْمَ) শব্দটি পরের আয়াতের শুরুতে যোগ হয়েছে। তখন এর অর্থ একটু ভিন্ন হবে পূর্বেকার অর্থ থেকে। আর তা হলো—

'তোমাদের ওপর (পূর্বের আল-ইয়াওমা কথাটি না থাকায় "আজ" হবে না) আজকে কোনো অভিযোগ নেই, আজ (পূর্বের অনুবাদে "আজ" শব্দটি ছিল না) আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।'

৭. উচ্চারণে পার্থক্য :

যেমন,

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

> 'আর সে (নূহ) বলল, তোমরা এতে আরোহণ করো। এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয়ই আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১২৪]

[১২৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯২।

এই আয়াতে আন্ডারলাইনকৃত মাজরাহা (مَجْرٜىٰهَا) শব্দকে আরবিতে অনেকে 'মাজরেহা'ও উচ্চারণ করে থাকেন। এমনিভাবে আরবি হরফ 'সিন' (س) ও সোয়াদ (ص) এর উচ্চারণে আরবদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণে অর্থের কোনোই পরিবর্তন সাধিত হয় না।

এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, এই সাত ধরনের হারফের কিরাত সবগুলোই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুমোদিত ও তাঁর থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

এর প্রমাণ নিম্নের হাদীসটি থেকে পাই—

> 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম (রদিয়াল্লাহু আনহু) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তাঁর কিরাত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাত পাঠ করেছেন; অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে এ সূরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে?' সে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।
>
> এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমার! তুমিও পড়ো। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত উপ-(আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ করো।[১২৫]

[১২৫] সহীহ বুখারি, ফাযায়িলুল কুরআন।

এ রকমটা করা হয়েছে উম্মাতের জন্যে সহজীকরণের জন্যেই। নিম্নের বর্ণনা দ্বারা এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

> উবাই ইবনু কা'ব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। সে এমন এক ধরনের কিরাত করতে লাগল আমার কাছে অভিনব মনে হলো। পরে আর একজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতে ভিন্ন ধরনের কিরাত করতে লাগল। সালাত শেষে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিরাত করেছে যা আমার কাছে অভিনব ঠেকেছে এবং অন্যজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী জন হতে ভিন্ন কিরাত পাঠ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে (কিরাত পাঠ করতে) নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই কিরাত পাঠ করল। নবি ﷺ তাদের দুজনের (কিরাতের) ধরনকে সুন্দর বললেন। ফলে আমার মনে নবি ﷺ-এর কুরআনের প্রতি মিথ্যা অবিশ্বাস ও সন্দেহের উন্মোষ দেখা দিল। এমন কি জাহিলি যুগেও আমার এমন খটকা জাগেনি। আমার ভেতরে সৃষ্ট খটকা অবলোকন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং যেন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মহামহীয়ান আল্লাহর দিকে দেখছিলাম। নবি ﷺ আমাকে বললেন, ওহে উবাই! আমার কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন এক হারফে তিলাওয়াত করি। আমি তখন তাঁর কাছে পুনরায় অনুরোধ করলাম আমার উম্মাতের জন্য সহজ করুন। দ্বিতীয়বার আমাকে বলা হলো যে, দুই হারফে তা তিলাওয়াত করবে। তখন তাঁর কাছে আবার অনুরোধ করলাম, আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিতে। তৃতীয়বার আমাকে বলা হলো যে, সাত হারফে তা তিলাওয়াত করবে এবং যতবার আপনাকে জবাব দিয়েছি তার প্রতিটির বদলে আপনার জন্য একটি সাওয়াল! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি বিলম্বিত করে রেখেছি সে দিনের জন্য যে দিন সারা সৃষ্টি এমন কি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।[১২৬]

উবাই ইবনু কা'ব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে,

> নবি ﷺ বানু গিফারের জলাভূমির (ডোবা) কাছে ছিলেন। উবাই (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আপনার উম্মাত এক ধরনের কুরআন পাঠ করবে। তখন নবি ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে

---

[১২৬] সহীহ মুসলিম, (ইফা), ৩/১৬৭, হা-১৭৮১।

> তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার উম্মাহ এ হুকুম পালনে সমর্থ হবে না। পরে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দ্বিতীয়বার তার কাছে আগমন করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত দু'ধরনের কুরআন পাঠ করবে। নবি ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার উম্মাহ তা পালনে সমর্থ হবে না। তারপর তিনি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত তিন হারফে কুরআন পাঠ করবে। নবি ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর সমীপে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাহ এটি পালনের সমর্থ রাখে না। তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চতুর্থবার নবি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত সাত হারফে কুরআন পাঠ করবে এবং এর যেকোনো হারফ ও ধরন অনুসারে তারা পাঠ করলে তা-ই যথার্থ হবে।[১২৭]

আর এই কিরাতগুলো আমরা বিভিন্ন ইমামদের নামে চিনে থাকলে ও এর মূল সূত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে। উল্লেখ্য যে, স্বল্পসংখ্যক রাবী দ্বারা বর্ণনাকৃত (মুতাওয়াতির নয় এমন), কোনো অপরিচিত (গাইরি মাশহুর), মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণিত, মাওদু (জাল-বানোয়াট) সনদে বর্ণিত ও শায (বিরল) ধরনের কিরাত গ্রহণযোগ্য নয়। কিরাতের বিখ্যাত ইমামদের নাম নিম্নরুপ—

১. নাফিয়ি ইবনু নুয়াইম (মৃ. ১৬৯ হিজরি)
২. আসিম ইবনু নুজুদ (মৃ. ১২৭ হিজরি)
৩. হামযাহ ইবনু হাবিব আল কুফি (মৃ. ১৫৬ হিজরি)
৪. ইবনু আমির (মৃ. ১১৮ হিজরি)
৫. আবূল হাসান কিসায়ি (মৃ. ১৮৯ হিজরি)
৬. ইবনু কাসীর (মৃ. ১২০ হিজরি)
৭. আবূ আমর ইবনু আলা (মৃ. ১৫৪ হিজরি)

সম্ভাব্য প্রশ্ন

এক : কুরআন যদি সাত হারফেই হয়ে থাকে তাহলে লাওহে মাহফুজে কোন হারফের কুরআন সংরক্ষিত আছে?

উত্তর : এর জবাব হাদীসেই আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

[১২৭] প্রাগুক্ত, হা-১৭৮৩।

> পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সুবিধার জন্যে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এর কাছে অন্যান্য হারফে শিখাতে অনুরোধ করেছেন, তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সাত হারফে কুরআন শেখান।

অর্থাৎ, কুরআন প্রথমে যেভাবে নাযিল হয়েছিল সেই কুরআনই লাওহে মাহফুযে সংরক্ষণ করা আছে। আল্লাহু আ'লামু।

দুই : কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব তো আল্লাহই নিয়েছেন; তাহলে এই কুরআন নিয়ে এত মতপার্থক্য কেন হবে?

উত্তর : এগুলো মোটেই কোনো মতপার্থক্য নয়। এতে কুরআনের চিরন্তন সত্যে একটুও ফাঁটল ধরেনি। আর পূর্বেই পরিষ্কার করা হয়েছে যে, এই 'মতপার্থক্যের' ধরন কেমন।

ওপরে কুরআনের ৭টি হারফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সময়েই খ্রিষ্টান প্রচারক কিংবা নাস্তিকরা বিভিন্ন প্রাচীন কুরআনের আংশিক অংশ (fragment) দেখিয়ে দাবি করতে চান যে, এগুলোতে সামান্য শব্দ ও বাক্যের পার্থক্য প্রমাণ করে—কুরআন না কি বিকৃত হয়ে গেছে! ওপরের আলোচনা দ্বারা তাদের অপযুক্তির অপমৃত্যু হলো। যেসব খ্রিষ্টান প্রচারক এইসব ভিন্ন হারফের দ্বারা উদ্ভুত কিরাত দেখিয়ে দাবি করতে চায় যে, 'কুরআনের ভিন্ন ভার্সন আছে', তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলব, কুরআনের ভিন্ন হারফগুলো আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত। আপনাদের বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে যে **হাজার হাজার ভিন্নতা আছে,** এগুলোর অনুমোদন কে করেছে? **এগুলোর মধ্যে কোনটা 'আসল' বাইবেল?** কোন **পাণ্ডুলিপিটা** যিশু বা তাঁর সহচররা অনুমোদন করেছেন বা পড়েছেন? এতক্ষণ বললাম বাইবেলের নতুন নিয়মের (New Testament) তথাকথিত 'মূলকপির' ব্যাপারে, যেগুলো গ্রিক ভাষায় লেখা; অথচ যিশু (ঈসা ﷺ) মোটেও গ্রিকভাষী ছিলেন না। খ্রিষ্টানদের কিতাবের তথাকথিত 'মূলকপি'গুলোও যিশুখ্রিষ্টের **নিজ ভাষায়** নেই। **অনুবাদের হাজার হাজার জালিয়াতি, হাজার হাজার ভিন্ন ভার্সন, একেক খ্রিষ্টান দলের একেক রকমের বাইবেল** এগুলোর কথা তো আলোচনাতেই আনিনি। যাদের নিজেদের কিতাবের অবস্থা এই, তারা কোন মুখে মুসলিমদের কিতাবের সমালোচনা করতে আসে?

পরিশেষে বলব, কিরাতের পার্থক্যের কারণে কুরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা অজ্ঞতা ও বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। বরং তখন থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন টিকে আছে কোটি কোটি হাফিজের দ্বারা, যারা একে বুকে ধারণ করেন। যারা আজও জমিনের বুকে হাঁটেন। যাদের মধ্যে আরবির প্রাথমিক জ্ঞানও নেই এমনও অনেকে আছেন। তবুও

তাঁরা সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষার একটি বইয়ের আগাগোঁড়া মুখস্থ করে রেখেছেন ও যুগ পরম্পরায় এটি একমাত্র এবং একমাত্র কুরআনেরই মুজিযা বা অলৌকিকতা, যার সামান্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর কোনো বই এই ধরণির বুকে পাওয়া যাবে না।

নিদর্শন তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেই; তবে নেওয়ার মতো কেউ কি আছে?

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মপালন ও উপাসনালয়ের অধিকার

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ একটি শারীয়াহ রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মপালন ও উপাসনালয়ের অধিকারের ব্যাপারে নাস্তিক-মুক্তমনাদের থেকে অনেক বিরূপ সমালোচনা শোনা যায়। এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব একটি শারীয়াহ রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মপালন ও উপাসনালয়ের ব্যাপারে কী নীতি অবলম্বন করা হয়।

অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিজ ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকে। এমনকি ইসলামি রাষ্ট্র তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে, সুরক্ষা দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত কাতারভিত্তিক ফাতওয়ার ওয়েবসাইট Islamweb এ বলা হয়েছে,

> '...**যিম্মির (ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) অবশ্যই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে।** অর্থাৎ, সে স্বাধীনভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারবে অথবা নিজ ধর্মের ওপর থাকতে পারবে। যদিও আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা এবং হৃদ্যতাপূর্ণভাবে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা।

ওপরে যেটি উল্লেখ করা হলো (ধর্মীয় স্বাধীনতা) সেটি তাদের মৌলিক অধিকারের একটি এবং তাদের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাজেই মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের গির্জাকে ভেতরকার এবং বাহিরকার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা। তাদের নিজ নিজ মন্দিরগুলোতে এবং গ্রামগুলোতে উপাসনা করবার অধিকারও রয়েছে। তবে তারা তাদের উপাসনার রসমগুলোকে মুসলিমদের সমাবেশ এবং রাস্তাগুলোতে প্রদর্শন করতে পারবে না, যার দরুন মুসলিমরা সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়...।'[১২৮]

বিনা জিযিয়ায় বসবাস

অমুসলিমদের উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী, ভিক্ষুক এদেরকে ইসলামি রাষ্ট্রে কোনো জিযিয়া করও দিতে হয় না। তারা বিনা জিযিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করেন।[১২৯] কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করলে হয়তো তাদেরকেও কর দিয়ে বসবাস করতে হতো।

উপাসনালয় ও এর অধিবাসীদের সুরক্ষা

ইসলামের নীতি হচ্ছে, অমুসলিমদের উপসনালয়ে যুদ্ধাবস্থাতেও হামলা করা যাবে না। যাজক, পুরোহিতদেরকে হত্যা করা যাবে না। তাদের উপাসনালয় জ্বালিয়ে দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যদল প্রেরণকালে বলতেন,

انْطَلِقُوا بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ أَبْعَثُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَغْلُوا، وَلَا تَجْبُنُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا تَحْرِقُوا كَنِيسَةً، وَلَا تَعْقِرُوا نَخْلًا

'তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যাত্রা করো। তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফরকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করছি : (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, (শত্রুপক্ষের) কারও চেহারা বিকৃতি ঘটাবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, **কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না** এবং কোনো বৃক্ষও উৎপাটন করবে না।'[১৩০]

[১২৮] "Rights of Non-Muslims in an Islamic State - Islamweb – Fatwas" https://www.islamweb.net/en/fatwa/84263/

[১২৯] 'আল-মুগনী' - ইবনু কুদামা মাকদিসী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭৩; 'বাদাই' - আল কাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১১১

[১৩০] আবদুর রাযযাক, 'মুসান্নাফ' : ৯৪৩০

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

كان إذا بعث جيوشه، قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع

> অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কোনো বাহিনী প্রেরণ করলে বলতেন, 'তোমরা গির্জার অধিবাসীদেরকে হত্যা করবে না।'[১০১]

নবি ﷺ-এর সাহাবিদের আমল

শারীয়াহ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মডেল হচ্ছে খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামল। এ সময়টিতে হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণ নুবুওয়াতের আদলে শাসন পরিচালনা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তিপত্রে তাদের সকল অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। তাঁর খলীফা আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ঐ সব অধিকার শুধু বহালই রাখেননি; বরং তাঁর খিলাফতের মোহর ও স্বাক্ষর দ্বারা ঐ চুক্তিপত্রটি সত্যায়িত করেন। তাঁর শাসনামলে যেসব রাজ্য ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনাধীনে এসেছিল, তিনি ঐ সব রাজ্যের অমুসলিমদের জন্য চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকারই বলবৎ রাখেন। ইরাকের হীরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ভাষা নিম্নরূপ :

أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصرا من قصورهم التي كانوا يتحصنون فيها إذا نزل بهم عدو لهم ولا يمنعون من ضرب النواقيس ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم

> অর্থ : 'তাদের **খানকাহ ও গির্জাগুলো ধ্বংস করা হবে না।** প্রয়োজনের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সব ইমারতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে সেগুলোও নষ্ট করা হবে না। **নাকুস ও ঘন্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না (তবে সালাতের সময়ে বাজাতে পারবে না)।** আর তাদের ঈদের বা **উৎসবের সময় (কেবল) ক্রুশ মিছিল বের করার ওপরও কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না।**'[১০২]

[১০১] ইবনু আবী শাইবা, 'মুসান্নাফ' : ৩৩৮০৪; কিতাবুল জিহাদ, যুদ্ধক্ষেত্রে যাদের হত্যা করা নিষেধ অধ্যায়। হাদীসটির সনদ সহীহ। https://www.dorar.net/h/1db96c35e4ed85d6e2d84fbe6f7fb2cc [শর্ট লিঙ্ক : https://rb.gy/u4ahq6]
অন্যত্র হাসান সনদেও বর্ণিত হয়েছে। https://www.dorar.net/h/9605fc33181a7af1d3e3[illegible]8f63669742 [শর্ট লিঙ্ক : https://rb.gy/7b5os6]

[১০২] 'কিতাবুল খারাজ' – ইমাম আবূ ইউসুফ, ১/১৭০। http://islamport.com/d/1/ajz/1/393/1042.html#
'ই'লাউস সুনান' – জাফর আহমাদ উসমানী ১২/৫২২; http://tiny.cc/elnkuz

উসামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে শাম অভিমুখে অভিযান প্রেরণের সময় তার প্রতি আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এই ছিল যে,

وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له

অর্থ : 'যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ অনেক লোকের সাক্ষাতও হবে, **যারা তাদের জীবনকে উপাসনালয়ের মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাদেরকে তোমরা তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবো**'।[১০৩]

মিসর-বিজয়ী সাহাবি আমর ইবনুল আস (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেখানকার অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তাতে উল্লেখ ছিল :

'পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা হচ্ছে মিসরবাসীদের প্রতি দেয়া আমর ইবনুল আস-এর একটি নিরাপত্তানামা, তাদের জানের জন্যে, তাদের ধন-দৌলতের জন্যে, **গির্জা, ক্রুশ, জল ও স্থলের জন্যে, কোনোকিছুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হবে না।** কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করা হবে না বা পরিহার করা হবে না। মিসরের বাসিন্দাগণ কর আদায় করবে যদি তারা এ সন্ধিনামায় একাত্মতা প্রকাশ করে...।'[১০৪]

তবে খলীফা উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময়ে আগ্রাসী পরাশক্তি বাইযানটাইনদেরকে পরাজিত করে জেরুজালেম বিজয়ের পরে সেখানকার খ্রিষ্টান অধিবাসীদের ব্যাপারে কিছু কঠোর শর্ত দেয়া হয়। বাইতুল মুকাদ্দাস এবং এর আশপাশের ভূমি ইসলামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জনপদের একটি। সেখানে নতুন করে গির্জা স্থাপনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাসহ আরও কিছু ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। চুক্তিনামার মধ্যে উল্লেখ ছিল :

'...ইহা হইতেছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমারকে প্রদত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ—আপনারা যখন আমাদের নিকট আগমন করিলেন, তখন আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে, আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যে, আমাদের ধন-সম্পত্তির জন্যে এবং আমাদের সব ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্যে আপনাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলাম। উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে

[১০৩] 'তাবারি', তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক', খ. ২, পৃ. ৪৬৩; ইবনু আছীর, 'আল-কামিল'... খ. ১, পৃ. ৩৬২
আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর গৃহীত পদক্ষেপগুলো জানার জন্য দেখুন : 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ আবু বকর আছছিদ্দীক রাদিআল্লাহু 'আনহু' - ড. আহমদ আলী, পৃষ্ঠা ৩৫২।
[১০৪] 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' – ইবন কাসির, ৭ম খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ১৮৪

আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা আমাদের নগরে বা উহার চতুষ্পার্শ্বে কোথাও কোনো নূতন গির্জা ইবাদাতখানা নির্মাণ করিব না; কোনো পুরাতন গির্জা বা ইবাদাতখানা মেরামত করিব না; ইতিপূর্বে যে সকল গির্জা ও ইবাদাতখানা মুসলিমদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, উহাদিগকে গির্জা ও ইবাদাতখানারূপে পুনঃপ্রচলিত করিব না; আমাদের কোনো গির্জায় রাত্রিতে বা দিনে কোনো মুসলিম অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দিব না; আমাদের গির্জাগুলির দ্বারসমূহ পথিক ও মুসাফিরদের জন্য উন্মুক্ত রাখিব; কোনো পথিক মুসলিম আমাদের আবাসস্থলের কাছ দিয়া

... ...

গির্জার প্রকাশ্য স্থানে ক্রুশ রাখিব না; মুসলিমদের রাস্তায় বা তাহাদের বাজারে ক্রুশ বা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করিব না; গির্জায় উচ্চ শব্দে ঘণ্টা বাজাইব না; মুসলিমদের উপস্থিতিতে গির্জায় উচ্চঃস্বরে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করিব না; ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনোরূপ মিছিল বাহির করিব না; মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করিব না;[১৩৫]

এ ছাড়া আরব উপদ্বীপের মধ্যেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্থায়ী বসবাস ও উপাসনালয় নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কথা সুন্নাহ থেকে পাওয়া যায়। প্রবন্ধের শেষাংশে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইন শা আল্লাহ।

ইসলামি আইনশাস্ত্রে এ ব্যাপারে বিধিবিধান

ইসলামি ফকিহগণ সকল দলিলের আলোকে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের উপাসনালয়ের বিধান আলোচনা করেছেন। আমরা এখন এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিধিবিধানগুলো ড. আহমদ আলী লিখিত 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করছি :

'ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরা নিজেদের এলাকা ও পরিমণ্ডলে **স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম প্রকাশ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করতে পারবে।** তবে একান্ত মুসলিম জনপদের[১৩৬] অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে ধর্ম-কর্ম পালন করতে দেয়া থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া অসঙ্গত নয়। ইসলামি রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে

[১৩৫] 'তাফসির ইবন কাসির', ৪র্থ খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), সুরা তাওবাহর ২৯ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৫৬৬-৫৬৭।

[১৩৬] একান্ত মুসলিম জনপদ বলতে সেসব অঞ্চলকে বুঝানো হয়, যেসব এলাকার ভূসম্পত্তি মুসলিমদের মালিকানাভুক্ত এবং যেসব এলাকাকে মুসলিমরা ইসলামি অনুষ্ঠানাদি উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

করলে এ ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করতে পারবে। মুসলিম জনপদগুলোতে তাদেরকে কেবল ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করতে এবং প্রকাশ্যে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে বের হতে নিষেধ করা হবে। **তবে মুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে অমুসলিমদের প্রাচীন উপাসনালয় থাকলে তার অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে।** ইসলামি সরকার তাতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।[১৩৭]

... ...

তাদেরকে **তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না।** দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যেকোনো কাজ তারা আপন বিবেকের দাবি অনুসারে করতে পারবে। এ কারণে **অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কোনোরূপ চাপ সৃষ্টি করা বিধেয় নয়।** এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ -"ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই" (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৬।) অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "তুমি কি লোকদেরকে মুমিন হবার জন্য বাধ্য করবে?" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৯।) অর্থাৎ **জোর করে কাউকে মুমিন বানানো তোমার কাজ নয়।** লোকদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়াই হলো তোমার একান্ত দায়িত্ব। তবে তাদের কেউ ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তা ভিন্ন কথা। এ কারণে কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করল এবং যদি প্রমাণিত হয় যে, সে একান্ত চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাহলে তার বেলায় মুরতাদের হুকম প্রযোজ্য হবে না।

মুসলিমরা যেসব কাজকে পাপ ও অপরাধ মনে করে, অমুসলিমরা এ ধরনের কোনো কাজকে বৈধরূপে জানলে **(যেমন : মদ সেবন, শূকর পালন ও ক্রয়-বিক্রয়, ক্রুশ বহন ও শঙ্খধ্বনি বাজানো এবং রমাদানের দিনে পানাহার প্রভৃতি) তা করতে তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না, যদি না তারা তা প্রকাশ্যে মুসলিমদের মধ্যে সম্পাদন করে।**[১৩৮]

অমুসলিমরা তাদের জনপদের মধ্যে পুরাতন উপাসনালয়গুলোর সংরক্ষণ ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন উপাসনালয়ও তৈরি করতে পারবে। "একান্ত মুসলিম জনপদের" অভ্যন্তরে নতুনভাবে অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরি করতে দেয়া যাবে না। তবে সেখানে **তাদের প্রাচীন উপাসনালয় থাকলে, তাতে**

[১৩৭] আল-কাসানী, 'বাদাই', খ. ৭, পৃ. ১১৩ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]
[১৩৮] আল-কাসানী, 'বাদাই', খ. ৭, পৃ. ১১৩ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যদি তা ভেঙ্গে যায়, একই জায়গায় তা পুনঃনির্মাণের অধিকার তাদের রয়েছে।[১৩৯] "একান্ত মুসলিম জনপদ নয়"—এ ধরনের এলাকায় অমুসলিমরা নতুন উপাসনালয় তৈরি করতে পারবে। অনুরূপভাবে যে এলাকা বর্তমানে "একান্ত মুসলিম জনপদ" নয়, সরকার যেখানে জুমুআ, ঈদ ও ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমরা নতুন উপাসনালয় তৈরি এবং প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে।

মুসলিমদের হাতে যেসব নগরী পত্তন হয়েছে (যেমন : বাগদাদ, কূফা, বসরা, ওয়াসিত প্রভৃতি), সেখানে অমুসলিমদেরকে নতুনভাবে কোনো উপাসনালয় তৈরির অনুমতি দেয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لا تبنى كنيسة في الإسلام و لا يجدد ما خرب منها "ইসলামি ভূখণ্ডে কোনো গির্জা না নির্মাণ করা যাবে, না কোনো জীর্ণ গির্জার সংস্কার করা যাবে।"[১৪০] অধিকন্তু, এ ধরনের নগরীতে অমুসলিমদেরকে মদ সেবন ও শুকরের ক্রয়-বিক্রয় করা থেকেও বারণ করা হবে।[১৪১] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "যে সব জনপদকে মুসলিমরা বাসযোগ্য বানিয়েছে, সেখানে অমুসলিমদের নতুন মন্দির, গির্জা ও উপাসনালয় বানানো, বাদ্য বাজানো এবং প্রকাশ্যে শূকরের গোস্ত ও মদ বিক্রি করার অধিকার নেই। তবে অনারবদের হাতে আবাদকৃত, পরে মুসলিমদের হাতে বিজিত এবং মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকারকারী জনপদে অমুসলিমদের অধিকার তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত হবে। মুসলিমরা তা মেনে চলতে বাধ্য হবে।"[১৪২]

যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত অমুসলিম জনপদের উপাসনালয় দখল করার অধিকার ইসলামি সরকারের রয়েছে। তবে সৌজন্যবশত এ অধিকার ভোগ করা থেকে বিরত থাকা এবং উপাসনালয়গুলোকে যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থায় বহাল রাখা উত্তম। **বিশিষ্ট ফকিহ আল-কাসানী বলেন, "প্রাচীন উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়।"**[১৪৩] উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলে যত দেশ বিজিত হয়েছে তার কোথাও কোনো উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলা হয়নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি। **আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলে** হীরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে এ কথাও লেখা হয়েছিল যে, **"তাদের খানকাহ ও**

---

[১৩৯] আল-কাসানী, 'বাদাই', খ. ৭, পৃ. ১১৪ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৪০] ইবনু হাজার আসকালানী, 'আদ-দিরায়াহ...', হা.নং: ৭৪১; ইবনু কুদামাহ, 'আল-মুগনী', খ.৯, পৃ. ২৮৫ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৪১] ইবনু কুদামাহ, 'আল-মুগনী', খ,৯,পৃ. ২৮৩ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৪২] মাওদূদী, 'ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান', পৃ. ৩৯৫ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৪৩] আল-কাসানী, 'বাদাই' খ. ৭,পৃ. ১১৪ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

গির্জাগুলো ধ্বংস করা হবে না। প্রয়োজনের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেসব ইমারতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে সেগুলোও নষ্ট করা হবে না। **নাকুশ ও ঘন্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। আর উৎসবের সময় ক্রুশ বের করার ওপরও কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না।"**[১৪৪] উমার ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) আঞ্চলিক গভর্নরদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দান করেছিলেন যে, ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، "**তারা যেন কোনো উপাসনালয়, গির্জা ও অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস না করে।"**[১৪৫][১৪৬]

প্রখ্যাত হাম্বলী ফকিহ ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসি (রহিমাহুল্লাহ) উমার ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ)-এর এই নির্দেশটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, **এ বিষয়টি ইজমার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে (তাদের উপাসনালয়গুলো অক্ষত রাখতে হবে)।**[১৪৭]

মুফতি তাকি উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন,

> 'নতুন উপাসনালয় নির্মাণের প্রসঙ্গে মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদরা একমত যে, যদি অমুসলিমদের সাথে তাদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণে অনুমতি দেবার ব্যাপারে চুক্তি হয়, তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র তাদেরকে এর অনুমতি দিতে বাধ্য থাকে। এ ব্যাপারে যদি এমন কোনো চুক্তি না থাকে, তাহলে তারা এমন উপাসনার গৃহ তাদের গ্রামীণ এলাকায় নির্মাণ করতে পারে। তবে মুসলিম অধ্যুষিত শহরাঞ্চলের ব্যাপারে আইনশাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারও কারও মতে তারা এসব শহরে নতুন উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না। (বাদাউস সানাই, ৭ : ১১৪) মালিকি মাযহাবে তাদেরকে এর অনুমতি দেয়া হয়, তবে সমাজের পরিস্থিতি অনুসারে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেবার এখতিয়ার থাকে। (আল খুরাশী, ৩ : ১৪৮) বাস্তবক্ষেত্রে এই অভিমতটিই অধিকাংশ মুসলিম দেশে গৃহীত হয়েছে।'

মুফতি তাকি উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ)-কে নির্দিষ্ট করে জিজ্ঞেস করা হয় ইসলামি রাষ্ট্রে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, জরথুস্ত্রবাদী ইত্যাদি ধর্মালম্বীদের ক্ষেত্রে এভাবে উপাসনালয়-সহ ধর্ম পালনের অধিকার আছে কি না। তিনি এর উত্তরে বলেন :

> 'ওপরে উল্লেখিত বিধান সাধারণভাবে সকল অমুসলিমের জন্য প্রযোজ্য।

---

[১৪৪] আবূ ইউসুফ, 'কিতাবুল খারাজ', পৃ. ১৪৪ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৪৫] 'আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ', খ,৭,পৃ. ১২৯ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৪৬] 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা' – ড. আহমদ আলী, পৃষ্ঠা ২৫-২৮

[১৪৭] 'আল-মুগনী' - ইবনু কুদামা মাকদিসী, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ৬১০
সূত্র : Mufti Taqi Usmani, "Answers to Your Questions", Monthly Al-Balagh International, Karachi, Vol.26 No.06 April 2015, pp. 33-36
https://www.icraa.org/qas-about-minorities-and-slaves-in-islamic-law/

এমনকি যারা আহলে কিতাব না তাদের জন্যও। কারণ, খলীফা উমার ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) এর নির্দেশনা শুধুমাত্র আহলে কিতাবদের জন্য ছিল না; বরং অগ্নিউপাসক (জরথুস্ত্রবাদী)দের জন্যও ছিল।'[১৪৮]

আমরা দেখলাম, কিছু নিয়মের অধীনে ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও অমুসলিমদের ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। অনেক সময় ইসলামবিরোধীরা সাহাবিদের একটি আমলের রেফারেন্স দেখিয়ে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে ইসলামে বুঝি অমুসলিমদের কোনো অধিকারই নেই! সাহাবিদের অন্যান্য রেফারেন্সগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে তারা আংশিক এক চিত্র উপস্থাপন করে। আমরা পাঠকদেরকে অনুরোধ করব ইসলামবিদ্বেষীদের প্রচারণায় বিচলিত না হয়ে সাহাবিদের জীবনী অধ্যয়ন করুন এবং আলিমদের সংস্পর্শে থাকুন, আলিমদের নিকট প্রশ্ন করে বিষয়গুলো বুঝে নিন।

'কানযুদ্ দাকায়িক' ('তাসহীলুল হাকায়িকে'র শরাহ) গ্রন্থেও এই নিয়মগুলো আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে :

'রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : لا خِصَاء فِي الإسلام والكنيسة

"খোজাকরণ ও গির্জার অবকাশ নেই।" আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নতুন করে তৈরির অবকাশ নেই। আর **যদি পুরাতন গির্জা বা উপাসনালয় ভেঙ্গে যায় তাহলে তা মেরামত বা পুনঃনির্মাণ করা যাবে।** কেননা, ভবন তো চিরস্থায়ী থাকে না। তাই তা মেরামত বা ভেঙ্গে গেলে **পুনঃনির্মাণ করা যাবে। আর বিদ্যমান গির্জা বা উপাসনালয় এর অনুমোদন তো আছেই। কেননা, শাসক যখন তাদেরকে দারুল ইসলামে বহাল রেখেছেন তখন তাদের উপাসনালয়সমূহ পুনঃনির্মাণেরও অনুমতি দিয়েছেন।**

তবে তা স্থানান্তর করা যাবে না। কেননা, স্থানান্তর করার অর্থ হলো নতুন করে তৈরি করা। **আর কেউ যদি তার ঘরের কোনো স্থানকে উপাসনালয় নির্ধারণ করে তবে তা নিষেধাজ্ঞার বাইরে।** আর এই নিষেধাজ্ঞা আরবের প্রতিটি শহর-গ্রাম সর্বত্রের জন্য প্রযোজ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب – "জাযিরাতুল আরবে দুটি দ্বীন একত্র হতে পারে না।" **আর অন্য স্থানের ক্ষেত্রে তা শহরের সাথে নির্দিষ্ট। গ্রামে প্রযোজ্য নয়। কেননা, ইসলামি মারকায ও নিদর্শনাবলী শহরেই প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।**'[১৪৯]

[১৪৮] Mufti Taqi Usmani, "Answers to Your Questions", Monthly Al-Balagh International, Karachi, Vol.26 No.06 April 2015, pp. 33-36 https://www.icraa.org/qas-about-minorities-and-slaves-in-islamic-law/

[১৪৯] 'কানযুদ দাকায়িক' ('তাসহীলুল হাকায়িক' শরাহ) – মূল : ইমাম নাসাফী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬২।

অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরা তাদের উপাসনালয় পুনঃনির্মাণ করতে পারবে। জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপে অমুসলিমদের উপাসনালয় নির্মাণের অনুমতি নেই। অন্যান্য অঞ্চলের শহরে এই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গ্রামে নেই। এখানে 'শহর' বলতে 'একান্ত মুসলিম জনপদ' এর কথা বলা হচ্ছে, যে ব্যাপারে একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি। আর 'গ্রাম' পরিভাষা দ্বারা যিম্মিদের নিজস্ব এলাকাকে বোঝানো হচ্ছে যেখানে ইসলামি মারকায ও নিদর্শনাবলী নেই।[১৫০]

এ ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাব ও ফকিহদের মধ্যে ভিন্ন কিছু অভিমতও রয়েছে। অনেক আলিম ভিন্ন মতটিকে শক্তিশালী বলেছেন।[১৫১]

জাযিরাতুল আরবে উপাসনালয় নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা

জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপে অমুসলিমদের স্থায়ী বসবাস বা উপাসনালয় নির্মাণের অনুমতি না থাকার বিষয়টি সুন্নাহর দলিলের আলোকে সুপ্রমাণিত। এই বিধানের ব্যাপারে অনেকের মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে। ড. আহমদ আলী লিখিত 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা' গ্রন্থ থেকে আমরা বিষয়টির ব্যাখ্যা উল্লেখ করছি।

> 'ইসলামি রাষ্ট্রে **অমুসলিমরা** স্বাধীনভাবে দেশের যেকোনো স্থানে, এমনকি মুসলিম জনপদেও মিলেমিশে বসবাস করতে পারবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার ও চাকুরি প্রভৃতির প্রয়োজনে **রাষ্ট্রের যেকোনো স্থানে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করা যাবে না।** তবে পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীতে তাদেরকে প্রবেশ, চলাফেরা ও বসবাস করতে দেয়া জায়িয নয়।[১৫২] আরব দেশের অন্যান্য ভূখণ্ডে অমুসলিমদেরকে বসবাস ও বিচরণের অধিকার দেয়া যাবে কি না— তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ অন্তিম মুহূর্তে তিনি চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে বলেন, - لا يجتمع دينان في جزيرة العرب - "আরব

[১৫০] এ প্রসঙ্গে হানাফি ফিকহের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন : 'ফতোয়া সুবকী', খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৮। তবে হানাফি ফিকহেও কেউ কেউ এ ব্যাপারগুলোতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। দেখুন : 'ফতোয়া শামি', খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০২।

[১৫১] https://dorar.net/article/49

[১৫২] এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফিগণের মতে- মক্কা নগরীতে অমুসলিমরা সরকারের অনুমতিক্রমে কিংবা সমঝোতার ভিত্তিতে প্রবেশ করতে পারবে। আর মদীনা শরীফে ব্যবসা-বাণিজ্য, আসবাবপত্র বহন, সংবাদ দান বা গ্রহণ প্রভৃতি যেকোনো প্রয়োজনে অমুসলিমদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া যাবে না। [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

জাযিরায়[১৫৩] দুটি ধর্ম একত্রে থাকতে পারবে না।"[১৫৪] أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ - "মুশরিকদেরকে তোমরা আরব জাযিরা থেকে বের করে দেবে।"[১৫৫] এ হাদীসগুলোর প্রেক্ষিতে ইমামগণ বলেছেন, কোনো অমুসলিমকে আরব ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়া যাবে না। তবে তারা যেকোনো প্রয়োজনে সেখানে সরকারের অনুমতি কিংবা সম্মতিক্রমে প্রবেশ করতে পারবে, চলাফেরা করতে পারবে এবং সাময়িকভাবে অবস্থানও করতে পারবে।[১৫৬]

উল্লেখ্য যে, আরব ভূখণ্ডে অমুসলিমদের প্রবেশ, বিচরণ ও বসবাসের ওপর বিশেষ বিধি-নিষেধের ব্যাপারে কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। আসল কথা হলো, আরব ভূখণ্ডটি ইসলামের সংরক্ষিত অঞ্চল। এখানে কেবল তারাই সাধারণভাবে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবে, যারা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস করে। যেমন প্রত্যেক দেশেই কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকে, যেখানে সে দেশের সাধারণ নাগরিকও প্রবেশ করতে পারে। দেশের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশাধিকারের বিধি-নিষেধের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন যেমন অবান্তর ও অযৌক্তিক, ঠিক তেমনিভাবে আরব ভূখণ্ডে অমুসলিমদের প্রবেশ ও বসবাস করার ওপর যে বিধি-নিষেধ আছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করাও নিতান্তই অবান্তর ও অযৌক্তিক।'[১৫৭]

সমগ্র আলোচনার সারাংশ হিসেবে বলা যায়—

১. ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে। সে চাইলে নিজ ধর্ম পালন করতে পারে। তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে জোর করা হয় না।

২. ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম সন্যাসী, উপাসনালয়ের সেবকদেরকে জিযিয়া কর দিতে হয় না।

---

[১৫৩] হাদীসে আরব জাযিরা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। শাফিয়ি ও হাম্বলী ইমামগণের মতে- এখানে আরব জাযিরা দ্বারা কেবল হিজায অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা এবং এতদুভয়ের সংলগ্ন অঞ্চলগুলোকে বুঝানো হয়েছে। তবে মালিকি ও হানাফিগণের মতে- কেবল হিজাযই নয়; বরং পুরো আরব ভূখণ্ডই জাযিরাতুল আরবের মধ্যে শামিল হবে। তাদের মতানুসারে জাযিরাতুল আরবের মধ্যে নাজদ, ইয়ামান, তিহামাহ ও আরূদ (ইয়ামামা থেকে বাহরাইন) প্রভৃতি দেশও অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইবনু আবিদীন, 'রাদ্দুল মুহতার', খ. ৪,পৃ. ৩৯২; ইবনু কুদামাহ, 'আল-মুগনী', খ. ৯, পৃ. ২৮৫-৬)। [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৫৪] ইমাম মালিক, 'আল-মুওয়াত্তা', হা.নং: ১৩৮৮; আল-বায়হাকী, 'আস-সুনানুল কুবরা', হা.নং: [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৫৫] আল-বুখারি, 'আস-সাহীহ', হা.নং : ২৮২৫, ২৯৩২, ৪০৭৮; মুসলিম, 'আস-সাহীহ', হা.নং : ৩০৮৯ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৫৬] ইবনু আবিদীন, 'রাদ্দুল মুহতার', খ. ৪,পৃ. ৩৯২; ইবনু কুদামাহ, 'আল-মুগনী', খ.৯, পৃ.২৮৫-৬ [ড. আহমদ আলী উল্লেখিত পাদটীকা]

[১৫৭] 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা' – ড. আহমদ আলী, পৃষ্ঠা ২৪-২৫

৩. ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিমদের উপাসনালয়কে সুরক্ষা দেয়, আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করে।
৪. ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপাসনালয় ধ্বংস করা হয় না। যুদ্ধাবস্থাতেও তাদের উপাসনালয় বা এর অধিবাসীদেরকে আক্রমণ করা হয় না।
৫. অমুসলিমরা নিজেদের গৃহে, নিজেদের জনপদে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় উপাসনা করতে পারে। তাদেরকে কোনো বাধা প্রদান করা হয় না।
৬. একান্ত মুসলিম জনপদে এবং আরব উপদ্বীপে অমুসলিমরা উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না।

উপসংহার

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম, কিছু নিয়ম-কানুন এবং শর্তের অধীনে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং উপাসনালয় নিয়ে বসবাস করতে পারে। এমনকি আমরা যদি সেক্যুলার রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থার দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখব, এখানেও যেকোনো ধর্মের লোককেই রাষ্ট্রের নিয়ম ও শর্ত মেনেই তা পালন করতে হয়। ইসলামের সমালোচকরা অনেক সময় একতরফাভাবে শারীয়াহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, তারা অন্য ধর্মের অনুসারীদের ওপর শর্তারোপ করে। অথচ পৃথিবীর অনেক দেশকেই দেখা যায় কোনো কোনো ধর্মের অনুসারীদের ওপর বিভিন্ন শর্তারোপ করে এমনকি কিছু ধর্মীয় বিধান পালন করতেও বাধাপ্রদান করে। এবং সেই দেশগুলো মোটেও মুসলিম দেশ না বা শারীয়াহ পরিচালিত দেশ না। পৃথিবীর অনেক দেশেই লাউডস্পিকারে আযান দেয়া যায় না, অনেক দেশেই মুসলিম নারীদের হিজাব বা নিকাব নিষিদ্ধ। এমন আরও উদাহরণ দেখানো যায়। আমরা কখনো এই দাবি করছি না যে, ইসলাম সকল ধর্মকে 'সমান' দৃষ্টিতে দেখে। কুরআনে স্পষ্ট ঘোষিত হয়েছে—

> 'আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলাম।'[১৫৮]

কিন্তু ইসলামবিরোধীরা যদি দাবি করে যে, ইসলামি রাষ্ট্রে অন্য ধর্মের লোকদের একদম কোনো অধিকারই নেই—আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ইসলামি রাষ্ট্র অন্য ধর্মের মানুষদেরকেও অধিকার প্রদান করেছে। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ এবং নাজাতের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলাম।

---

[১৫৮] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বোরাকে করে আসমানে গমন করেছিলেন?

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

অনেক সময়ে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসে ইসরা-মিরাজের রাতে বায়ুশূন্য মহাকাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ কী করে কোনো জন্তুর পিঠে করে আসমানে গেলেন। এখানে আমরা ইসলাম প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে কী বলে তা জানবার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলার বাণী এবং তাঁর নবি ﷺ-এর হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয়, সেটিই চূড়ান্ত। এখানে বিষয়টি বুঝবার জন্য আমরা তিন ধরনের আলোচনার অবতারণা করব—

ক) সহীহ হাদীসে ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে কোন বিষয়গুলো অধিক পরিমাণে বলা হয়েছে?

খ) সিঁড়ি জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে আসমানে ভ্রমণ করার ব্যাপারে কি কোনো হাদীস এসেছে?

গ) বোরাকে বা বোরাকে করে আসমানে ভ্রমণ করার হাদীস কি বিশুদ্ধ? আর বিশুদ্ধ হলে তার ব্যাখ্যা আলিমগণ কীভাবে করেছেন ও কেন করেছেন?

[আলোচনা শুরু করার আগে একটি কথা জেনে রাখি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসরা ও মিরাজের বিষয়টি তাঁর উম্মাতের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সাহাবিদের থেকেও সেই বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এটাও মনে রাখা জরুরি যে, কোনো বিষয়ে কোনো একজন সাহাবি থেকে ব্যতিক্রমী ইজতিহাদ পাওয়া যাওয়া অসম্ভব কিছু না। এবং অনেক হাদীসের সনদ বা সূত্র সহীহ হলেও মতন বা মূলকথা অন্যান্য হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে

গরুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তাতে রোগ আছে।[১৫৭] অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার জন্য গরু যবাই করেছেন বলেও হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অর্থ মোটেও এই নয় যে, নবি ﷺ স্ববিরোধী কর্ম করেছেন। বরং এর দ্বারা হাদীসের সনদের সাথে সাথে এর মতন বিশ্লেষণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সনদের সাথে সাথে হাদীসের মতন বিশ্লেষণ করলে সঠিকভাবে হুকুম অনুধাবন করা যায়। এজন্য হাদীস যাচাইয়ের সময় মুহাদ্দিসগণ সনদ ও মতন দুটি নিয়েই আলোচনা করে থাকেন। হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য মূল মতন শায ও ইল্লাত থেকে মুক্ত হতে হয়। মুহাদ্দিগণ অনেক সময় হাদীসকে সনদকে সহীহ বলে উল্লেখ করেন; কিন্তু এর মতন সহীহ থাকে না। সনদের সাথে সাথে মতন সহীহ না হলে ঐ হাদীস চূড়ান্তভাবে সহীহ হয় না।]

প্রথম আলোচনা

সহীহ বুখারিতে এসেছে,

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: " بَيْنَمَا أَنَا فِي الحَطِيمِ، - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الحِجْرِ - مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَقَدَّ: قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ - فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ، وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ، - فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ: هُوَ البُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ - يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟

হুদবা ইবনু খালিদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ... মালিক ইবনু সা'সা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবি ﷺ-কে যে রাতে (বাইতুল মাকদিসে) ভ্রমণ করানো হয়েছে সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'একদা আমি কাবা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম। ...তারপর সাদা রং এর একটি

[১৫৭] মুস্তাদরাক হাকিম, ৮২৩২।

জন্তু আমার নিকট আনা হলো, যা আকারে খচ্চর থেকে ছোট ও গাধা থেকে বড় ছিল।' জারূদ তাঁকে বলেন, হে আবূ হামযা, ইহাই কি বোরাক? আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ। সে একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে। আমাকে তার ওপর সাওয়ার করানো হলো। তারপর আমাকে নিয়ে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চললেন...।[১৬০]

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أُتيتُ بالبُراقِ ، وهو دابَّةٌ أبيضُ طويلٌ ، فوق الحمارِ ، ودونَ البغلِ ، يضعُ حافرَه عند مُنتهَى طرْفِه ، فركبتُه ، حتى أتيتُ بيتَ المقدسِ ، فربطتُه بالحلْقةِ التي تَربِطُ بها الأنبياءُ

'আমার কাছে বোরাক আনা হলো। তা ছিল সাদা রং-এর একটি জন্তু। আকৃতিতে গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চাইতে ছোট। (এর চলার গতিবেগ এমন যে) যেখানে তার দৃষ্টি পৌঁছে সেখানেই তার প্রতিটি পদক্ষেপ গিয়ে পৌঁছায়।' তিনি বলেন, 'আমি তার ওপর সাওয়ার হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস এসে উপস্থিত হলাম। এরপর অন্যান্য নবিরা যে খুঁটির সাথে তাঁদের সাওয়ারীর পশু বেঁধে রাখতেন, আমিও আমার সাওয়ারী তার সাথে বেঁধে নিলাম।'[১৬১]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ، فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ، وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ

'যখন আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলাম, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর আঙুল দ্বারা পাথর ছেদ করলেন এবং বোরাককে এর সাথে বাঁধলেন।'[১৬২]

এসব হাদীস থেকে এতটুকু স্পষ্ট হয়ে যায় যে,

ক. রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বোরাকে সফর করেছিলেন।

খ. বোরাককে বেঁধে এরপর সেখানে প্রবেশ করেন।

গ. এবং এরপর সেখানে সালাত আদায় করেন।

কিন্তু তিনি ﷺ কি আসমানে বোরাক নিয়ে গমন করেছিলেন? এসব রিওয়ায়েত থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানা গেল না।

---

[১৬০] বুখারি, ৩৬০৮, সহীহ।

[১৬১] মুসলিম, ১৬২, সহীহ।

[১৬২] তিরমিযি, ৩১৩২; সিলসিলাতুল আহাদিস আস-সহীহা, ৭/১৪২৫; মুসতাদরাক হাকিম, ২/৩৬০।

নবি ﷺ আসমানে কীভাবে গমন করলেন তা জানবার জন্য আমরা এবার দ্বিতীয় আলোচনার অবতারণা করব।

দ্বিতীয় আলোচনা

দ্বিতীয় আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমরা জেনে রাখি : **'মিরাজ' শব্দের অর্থ হলো সিঁড়ি।**[১৬৩]

এবং **'ইসরা' শব্দের অর্থ হলো রাতের ভ্রমণ।**

কিছু কিছু দুর্বল হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আসমানে নেয়ার জন্য সিঁড়ি-জাতীয় এক ধরনের বস্তু ব্যবহার করা হয়। যেমন, ইমাম বাইহাকি (রহিমাহুল্লাহ) আবূ সাঈদ খুদরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قَالَ: "ثُمَّ دَخَلْتُ أَنَا وَجِبْرِيلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِالْمِعْرَاجِ

> 'তারপর আমি ও জিবরীল বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম এবং সালাত আদায় করলাম। অতপর আমার জন্য সিঁড়ি (মিরাজ) আনা হলো।'[১৬৪]

ইবনু ইসহাক আবূ সাঈদ খুদরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একই কথা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এতটুকু বেশি আছে যে, '...বাইতুল মুকাদ্দাসে যা কাজ তা শেষ করার পর সিঁড়ি (মিরাজ) আনা হলো। ইতোপূর্বে এমন সুন্দর সিঁড়ি আমি দেখিনি। ...আমার সাথি (জিবরীল) তাতে আমাকে আরোহণ করালেন; এমনকি আমাকে নিয়ে আসমানের দরজায় এসে পৌঁছালেন।'[১৬৫]

কা'ব (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও সিঁড়ির কথা বর্ণনা করেছেন।[১৬৬]

তবে এসব বর্ণনায় কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আরও কিছু বর্ণনা রয়েছে যেগুলো বেশ দুর্বল। তবে সহীহ হাদীসগুলো সামনে রাখলে একটি বিষয় স্পষ্ট ফুটে উঠে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজের ঘটনা এত বিস্তারিত বর্ণনা করা সত্ত্বেও প্রথম দফার বোরাকের মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরের কথা পরিষ্কার করে বললেও আসমান ভ্রমণের জন্য বোরাকের ব্যবহারের কথা স্পষ্ট করে বলেননি। তবে আরবি

---

[১৬৩] নিহায়া ফি গরিবীল হাদীস, ৩/২০৩।
[১৬৪] দালায়িলুন নুবুওয়াত, ২/৩৯০-৩৯১।
[১৬৫] সিরাতু ইবনি হিশাম, ১/৪০৩।
[১৬৬] ফাজায়েলে বাইতুল মুকাদ্দাস, ১৫৯-১৬০।

জানা কোনো ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার ধরন ও এসব বর্ণনা খেয়াল করলে বুঝতে পারবে যে, আসমানের সফর বোরাকের মাধ্যমে হয়নি। বরং সিঁড়ি জাতীয় বস্তু বা মিরাজের দ্বারা হয়েছিল। এর আলোকেই সেই রাতের নামকরণ হয়েছে ইসরা ও মিরাজের রাত।

এ জন্যই ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج؛ وهو السلم، فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه بعض الناس؛ بل كان البراق مربوطًا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজ (সালাত ও নবিদের সাথে সাক্ষাত) শেষ করলেন, তখন তাঁর জন্য সিঁড়িজাতীয় বস্তু (মিরাজ) আনা হলো এবং এতে করে তিনি আসমানে গমন করেন। বোরাকে করে যাননি। যেমন কতিপয় মানুষ তা ধারণা করে থাকে। বরং বোরাক বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজার সাথে বাঁধা ছিল যেন তাতে করে তিনি আবার মক্কায় ফিরে আসতে পারেন।'[১৬৭]

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

الصحيح الذي تقرر من الأحاديث الصحيحة أن العروج كان في المعراج لا على البراق

'বিশুদ্ধ মত যা সহীহ হাদীস থেকে স্থিরকৃত হয়েছে, আকাশে গমন মিরাজ বা সিঁড়িজাতীয় এক ধরনের বস্তুর মাধ্যমে হয়েছিল, বোরাকের মাধ্যমে নয়।'[১৬৮]

বোরাকে করে আসমানে ভ্রমণ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো কি আদৌ বিশুদ্ধ? এ সম্পর্কে জানার জন্য আমরা এবার তৃতীয় আলোচনার অবতারণা করব।

তৃতীয় আলোচনা

যির ইবনু হুবাইশ (রহিমাহুল্লাহ), তিনি হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিরাজের কথা এভাবে বর্ণনা করেন—

أُتِيَ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، فَلَمْ يُزَايِلاَ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبْرِيلُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَصَعِدَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ.

[১৬৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/১৩৮।

[১৬৮] আয়াতুল কুবরা ফি শরহে কিসসাতুল মিরাজ, ৬০।

> 'তাঁর (নবি ﷺ) জন্য বোরাক আনা হলো। তা ছিল সাদা রং-এর একটি জন্তু। আকৃতিতে গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চাইতে ছোট। তিনি ও জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছা পর্যন্ত এর পিঠেই ছিলেন। অতঃপর এতে করেই জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসমানে আরোহণ করেন।'[১৬৯]

এই হাদীসের সনদ সহীহ দেখে অনেকে মনে করে, মিরাজ বা আসমানে ভ্রমণ বুঝি বোরাকের মাধ্যমে হয়েছিল!

অথচ পুরো হাদীসের কয়েকটি বিষয়ে অন্যান্য সহীহ হাদীসের সাথে এই বর্ণনাটি সাংঘর্ষিক। হাদীসের পূর্ণ অংশের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

ক. হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছেন যে, এই রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত পড়েননি। অথচ বহু সহীহ হাদীসে এর বিপরীত কথা আছে।

খ. রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদের দরজায় বোরাককে বাঁধার কথা সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। অথচ হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় এই তথ্যকে নাকচ করা হয়েছে।

গ. আরবি ভাষার বর্ণনারীতি এবং অন্যান্য সহীহ ও দুর্বল হাদীসের আলোকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি বোরাকের মাধ্যমে শুধু বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করেছিলেন। কিন্তু এই হাদীসে বলা হয়েছে, আসমান পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে বোরাকের পিঠে করেই সফর করেছিলেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-ও বোরাকের পিঠে ছিলেন। অথচ এমন কোনো কথা এই হাদীস ছাড়া আর কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীসে পাওয়া যায় না।

ঘ. এবং হাদীসটি থেকে বোঝা যায় যে, হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এই কথাগুলোকে স্পষ্ট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করেননি। বরং এটিকে তাঁর ইজতিহাদ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

যদি শুধু বোরাকের মাধ্যমে আসমান সফরের কথা মেনেও নেয়া হয়, তাহলে এর ফলে বাকি যেসব বিষয়ে সহীহ হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর সমাধান দেয়া কি আদৌ সম্ভব?

এ কারণেই সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ اسْتَمَرَّ عَلَى الْبُرَاقِ حَتَّى عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ مُقْتَضَى

[১৬৯] মুসনাদু আহমাদ, ২৩৩৮০; সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা, ৮৭৪।

كَلَام بن أَبِي جَمْرَةَ الْمَذْكُورِ قَرِيبًا وَتَمَسَّكَ بِهِ أَيْضًا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِعْرَاجَ كَانَ فِي لَيْلَةٍ غَيْرِ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَمَّا الْعُرُوجُ فَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُرَاقِ بَلْ رَقِيَ الْمِعْرَاجَ وَهُوَ السُّلَّمُ كَمَا وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيث أَبِي سعيد عِنْد بن إِسْحَاقَ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي الدَّلَائِلِ وَلَفْظُهُ فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ كَالْبَغْلِ مُضْطَرِبَ الْأُذُنَيْنِ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تَرْكَبُهُ قَبْلِي فَرَكِبْتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ أَنَا وَجِبْرِيلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصليت ثمَّ أتيت بالمعراج وَفِي رِوَايَة بن إِسْحَاق سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أُتِيَ بِالْمِعْرَاجِ فَلَمْ أَرَ قَطُّ شَيْئًا كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ إِلَيْهِ الْمَيِّتُ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ فَأَصْعَدَنِي صَاحِبِي فِيهِ حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةِ كَعْبٍ فَوُضِعَتْ لَهُ مَرْقَاةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمَرْقَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ حَتَّى عَرَجَ هُوَ وَجِبْرِيلُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي سَعِيدٍ فِي شَرَفِ الْمُصْطَفَى أَنَّهُ أُتِيَ بِالْمِعْرَاجِ مِنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ وَأَنَّهُ مُنَضَّدٌ بِاللُّؤْلُؤِ وَعَنْ يَمِينِهِ مَلَائِكَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَائِكَةٌ وَأَمَّا الْمُحْتَجُّ بِالتَّعَدُّدِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ التَّقْصِيرُ فِي ذَلِكَ الْإِسْرَاءِ مِنَ الرَّاوِي وَقَدْ حَفِظَهُ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَوَصَفَهُ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءَيْنِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ ثُمَّ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ دَالٌّ عَلَى الِاتِّحَادِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ أَنْكَرَهُ حُذَيْفَةُ فَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالَ تُحَدِّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ أَخَافَ أَنْ يَفِرَّ مِنْهُ وَقَدْ سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي يَعْنِي مَنْ أَثْبَتَ رَبْطَ الْبُرَاقِ وَالصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ عَلَى مَنْ نَفَى ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَأَتَى جِبْرِيلُ الصَّخْرَةَ الَّتِي بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَوَضَعَ إِصْبَعَهُ فِيهَا فَخَرَقَهَا فَشَدَّ بِهَا الْبُرَاقَ وَنَحْوُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَأَنْكَرَ حُذَيْفَةُ أَيْضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَوْ

صَلَّى فِيهِ لَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ فِيهِ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ مَنْعُ التَّلَازُمِ فِي الصَّلَاةِ إِنْ كَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفَرْضَ وَإِنْ أَرَادَ التَّشْرِيعَ فَنَلْتَزِمُهُ وَقَدْ شَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَرَنَهُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِهِ فِي شَدِّ الرِّحَالِ وَذَكَرَ فَضِيلَةَ الصَّلَاةِ فِيهِ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَأَوْثَقْتُ دَابَّتِي بِالْحَلْقَةِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تَرْبِطُ بِهَا وَفِيهِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَجِبْرِيلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَعَرَفْتُ النَّبِيِّينَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَسَاجِدٍ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ عِنْد بن أَبِي حَاتِمٍ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى اجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا صُفُوفًا نَنْتَظِرُ مَنْ يَؤُمُّنَا فَأَخَذَ بِيَدِي جِبْرِيلُ فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَفِي حَدِيثِ بن

অর্থ : সারকথা হলো, তিনিও বুঝাতে চেয়েছেন এই হাদীসে যে বলা হয়েছে—**'তিনি বোরাকের মাধ্যমে আসমান ভ্রমণে গিয়েছিলেন'—কথাটি ঠিক নয়। অন্যান্য হাদীসের আলোকে এটি বোঝা যায়।** এবং এই হাদীসে যে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত পড়েননি, সেই কথাটিও ঠিক না। এবং **তিনি যে বোরাককে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদের দরজায় বাঁধেননি বলে বলা হয়েছে, তাও অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদীসের পরিপন্থী।**[১৭০]

তাই তো তিনি অন্য আরেকটি বিষয় আলোচনা করা সময় এই হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন যে,

أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُرَاقِ فَلَمْ يُزَايِلْ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبْرِيلُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَهَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ حُذَيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيحْتَمل انه قَالَ عَنِ اجْتِهَادٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ هُوَ وَجِبْرِيلُ يَتَعَلَّقُ بِمُرَافَقَتِهِ فِي السَّيْرِ لَا فِي الرُّكُوب

অর্থ : 'হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করেননি। বরং এই সম্ভাবনা আছে যে, এটা তিনি ইজতিহাদ করে

[১৭০] ফাতহুল বারী, ৭/২০৮।

> নিজের থেকে বলেছেন। এবং এই সম্ভাবনাও আছে যে তিনি আর জিবরাঈল সফরে খুব কাছাকাছি ছিলেন, একসাথে বোরাকের পিঠে আরোহণ করেননি। (এই কাছাকাছি থাকা বোঝাতে এক সাথে বোরাকের পিঠে চড়েছেন শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে।)'''[১৭১]

সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ)-ও একইরকম অভিমত পোষণ করেছেন।

> 'বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত পড়া ও বোরাক বাঁধাকে হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য রাবীগণ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ- হতে বর্ণনা করেছেন। **আর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা হতে অধিক গ্রহণযোগ্য।**'[১৭২]

পরিশেষে বলব, এখানে কারও ভিন্নমত থাকলেও যারা এই কথার প্রমাণ দিয়েছেন যে, বোরাকের মাধ্যমে শুধু বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত মিরাজ হয়েছে এবং আসমান ভ্রমণ মিরাজে (সিঁড়িতে) করে হয়েছে—তাদেরকে অপবাদ দেবার সুযোগ নেই। যেহেতু তাঁদের কথার পক্ষে দলিল আছে এবং পূর্বযুগের গ্রহণযোগ্য আলিমদের যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে। কারও এখানে দ্বিমত থাকলে ভিন্ন কথা, কিন্তু অন্যদেরকে নিজের মত মানতে জোর করা উচিত নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবি ﷺ এর ইসরা-মিরাজ সত্য, তা আল্লাহর বড় নিদর্শনের একটি, এই ভ্রমণ স্বশরীরে এবং বাস্তবেই হয়েছে। উম্মাহ এর ওপরে একমত রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক কথাগুলো সঠিকভাবে মানার তাওফিক দান করুন। আমীন।

---

[১৭১] ফাতহুল বারী, ৭/২০৭।

[১৭২] তাফসীর ইবনু কাসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), সূরা বানী ইসরাঈলের ... আয়াতের তাফসীর, পৃষ্ঠা- ২২৫ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮।

একটি শ্বেতসারীয় উপাখ্যান

মুহাম্মাদ মশিউর রহমান

কার্বোহাইড্রেট।

কিংবা শ্বেতসার।

এ বস্তুর নাম গোটা জীবনে অন্তত একবার হলেও শোনেনি—এমন আদমসন্তান বোধহয় খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত—এখন হোক সে বান্দা কম্পিউটার সাইন্সের ছাত্র, কি পরিসংখ্যানের ছাত্র, অথবা রকেট সায়েন্টিস্ট বা ড্রোন আবিষ্কারক, কিংবা চারুকলা ইন্সটিটিউটে গবেষণাকারী 'বিজ্ঞানমনস্ক' সম্প্রদায়।

আর বিশেষ করে আমাদের এই দেশে—যেখানে মাঝেমধ্যে সকালের নাস্তা এবং বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনের তালিকায় থাকা রুটিসহ বেশিরভাগ মানুষের মূল খাদ্য হলো ভাত তথা কার্বোহাইড্রেট।

ভাত, রুটি, চাল, গম ইত্যাদি যাই বলা হোক না কেন, বায়োকেমিক্যাল (প্রাণরসায়নিক) পরিভাষায় এর সবগুলোকেই মোটাদাগে বলা হয়ে থাকে কার্বোহাইড্রেট—এর কোনো হেরফের নেই। তবে হ্যাঁ, পার্থক্য তো কিছু অবশ্যই আছে। তা না হলে এত বিশাল সীমাহীন বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগত হলো কোথা থেকে? যাই হোক, ডানে-বায়ে না কেটে মূল আলোচনায় আসার চেষ্টা করা যাক।

কার্বোহাইড্রেট, কিংবা শর্করা, অথবা শ্বেতসার—যাই বলা হোক না কেন, অন্যতম ৫টি খাদ্য উপাদানের এই একটিকে ঢালাওভাবে মোট তিনটা ক্লাস বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

১. মনোস্যাকারাইড

২. অলিগোস্যাকারাইড এবং

৩.পলিস্যাকারাইড

মনোস্যাকারাইড হলো ১টি মাত্র শর্করা একক নিয়ে গঠিত, যেমন গ্লুকোজ; অলিগস্যাকারাইড মোটামুটিভাবে ২-১০টি এককে গঠিত, যেমন সুক্রোজ—যা চিনি হিসেবে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়; আর পলিস্যাকারাইডগুলো গড়পড়তায় ১০টির বেশি পুনরাবৃত্তি এককে তৈরি—এগুলো হলো সব প্রাথমিক ধারণা। কিন্তু যখনই না একটু গভীরে ডুব দেওয়া শুরু হয়, বোঝা যেতে থাকে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, এই সাড়ে তিনহাত শরীরের অভ্যন্তরে, প্রতিটা মুহূর্তেই আমাদের অজান্তেই যে কত শত-হাজারটি বিস্ময়কর আর অলৌকিক ব্যাপার বিরতিহীনভাবে ঘটে চলেছে। খেয়াল করে দেখলে যেগুলো কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয়, যদি দেখার উপযুক্ত চোখ এবং উপলব্ধি করার মতো বাস্তব অর্থেই একটি মুক্ত মন থেকে থাকে।

যাই হোক, আলোচনায় ফেরা যাক। কথা হচ্ছিল কার্বোহাইড্রেট নিয়ে। আমাদের তথা বিশ্বের অনেক স্থানেই অধিকাংশ খাদ্যবস্তু ও শক্তি সরবরাহকারী উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, মূলত পলিস্যাকারাইডস।

যেমন ধরা যাক, চালে সঞ্চিত হয়ে থাকা স্টার্চের কথা। এই স্টার্চ মূলত আর কিছুই না, মূলত গ্লুকোজের ২টি পলিমার। অর্থাৎ, অসংখ্য গ্লুকোজ অণু বা একক একের-পর-এক সংযুক্ত হয়ে বিশাল বড় ২টি শেকল গঠন করে, যার একটি শাখাবিহীন এবং অন্যটি শাখাযুক্ত। এভাবে পলিমারাইজেশন বা একত্রে অনেকগুলো অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে বিশাল কাঠামো গঠনের অন্যতম সুবিধা হলো, প্রয়োজনের সময় সহজেই বিপুল সংখ্যক গ্লুকোজ অণুর যোগান দেওয়া সম্ভবপর হয়। এখন এই যেমন উদ্ভিদে সঞ্চিত বা স্টোরড কার্বোহাইড্রেট হিসেবে স্টার্চ রয়েছে, ঠিক তেমনি প্রাণীদেহে সঞ্চিত হওয়া কার্বোহাইড্রেটও আছে; যার নাম হলো গ্লাইকোজেন—যেটাকে 'প্রাণীজ স্টার্চ' নামেও অভিহিত করা হয়। এই গ্লাইকোজেন আচার-আচরণে স্টার্চেরই অনুরূপ বলা যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে। স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন উভয়েই গ্লুকোজের পলিমার হওয়া সত্ত্বেও স্টার্চে যেখানে ২টি শেকল থাকে, গ্লাইকোজেনে সেখানে থাকে ১টি শেকল। গ্লাইকোজেনের শেকলটি স্টার্চের শাখাযুক্ত শেকলটির মতোই শাখাযুক্ত। কিন্তু শাখা সৃষ্টি হবার সংখ্যা স্টার্চের তুলনায় অনেক বেশি। এসব ব্যাপারে কিছু পরে আসার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তো, পূর্বে যে ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল, খাদ্য হিসেবে কার্বোহাইড্রেটের কথা। আমরা যখন কোনো খাবার খাই, তাতে যে কার্বোহাইড্রেটই থাকুক না কেন—মনো, অলিগো কিংবা পলিস্যাকারাইড—সেটা থেকে শক্তি পেতে হলে তাকে গ্লুকোজ নির্ভরশীল রাস্তা (গ্লাইকোলাইসিস) হয়েই যেতে হয়। অর্থাৎ আপনি দুধ খান, কিংবা চিনি খান, অথবা ভাত খান কি রুটি খান—শক্তি পেতে হলে এর সবগুলোর

কার্বোহাইড্রেট অংশকেই ভেঙে গ্লুকোজের রাস্তা হয়েই আগে বাড়তে হবে। এখন হয় তা সরাসরি বদলে গিয়ে সে রাস্তায় যাবে, আর না হলে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে সেখানে যাবে। এখন আপাতত বোঝার ও আলোচনার সুবিধার্থে সবচাইতে সরল কার্বোহাইড্রেট খাবার, অর্থাৎ ভাত নিয়েই কথা বলা যাক। কারণ, ভাতের সম্পূর্ণটাই গ্লুকোজ, এর ভিন্ন আর কোনো কার্বোহাইড্রেট নেই তাতে। এই ভাত খাবার পর যখন তা হজম হওয়া আরম্ভ হয়, তখন তা 'আলফা-অ্যামাইলেজ' নামক এক এনজাইমের প্রভাবে ভেঙে গ্লুকোজ অণুমুক্ত হয়। এই গ্লুকোজ অণুগুলো রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে যায় এবং ইনসুলিন নামক হরমোনের উপস্থিতিতে সেসব স্থানের কোষের মেমব্রেন ঝিল্লিতে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ১২ ধরনের GLUT নামক ট্রান্সপোর্টার প্রোটিনের মাধ্যমে কোষের ভেতরে শোষিত হয়।

এ পর্যন্ত তো গেল খাওয়া থেকে হজম হওয়া, কোষে শোষিত হওয়া ইত্যাদি পর্যন্ত হওয়া চলা মোটামুটি একটা বর্ণনা—যার বিস্তারিত বায়োকেমিক্যাল (প্রাণরাসায়নিক) ও বায়োফিজিক্যাল (প্রাণপদার্থবিদ্যা) বিবরণ শুরু করলে আর্টস, কমার্স, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতি ব্যাকগ্রাউন্ডের বিজ্ঞানীরা দেখা যাবে ভিমড়ি খেয়ে জ্ঞানই হারিয়ে ফেলবেন। প্যাঁচা, শিয়াল, বাঘ, ভাল্লুকের মুখোশ নিয়ে মঙ্গল কামনা করতে বের হওয়া প্রবল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রদায়কে এত আগেই ভড়কে দেওয়াটা মোটেই তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে না, আর তা এই মুহূর্তে উদ্দেশ্যও না।

কাজেই এগিয়ে যাওয়া যাক।

ভাত খাবার পর রক্তের মাধ্যমে স্বীয় ঠিকানায় তো বেশ অনেকখানি গ্লুকোজ পৌঁছে গেল; কিন্তু যে গ্লুকোজ অণুগুলোর প্রয়োজনের অতিরিক্ত থেকে যায়, সেগুলো? সেগুলোর কি কোনো কাজ নেই?

যেহেতু বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞানের ঠিকাদারেদের প্রমাণ ও ভিত্তিহীন দাবি অনুযায়ী এসমস্ত কিছু 'এমনি এমনিই' তৈরি হয়ে যায়নি, কাজেই অতিরিক্ত গ্লুকোজ অণুগুলোরও অবশ্যই কাজ আছে। আর সে কাজ হলো, সেগুলো সেই পূর্বোল্লিখিত গ্লাইকোজেন হিসেবে দেহে, যেমন বলা যায়- লিভার সেল বা যকৃতকোষে সঞ্চিত থাকে।

এই দেশের অনলাইনে কিংবা 'চারুকলা ল্যাবোরেটরিতে' বিজ্ঞান চর্চাকারীরা যখন ঘাড়ের রগ কয়েক গুণ মোটা করে ফুলিয়ে—বিশ্বজগত ও এর মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু শুধু কিছু অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনার মাধ্যমে 'অযথাই' তৈরি হয়েছে—এ মতবাদ ঝাড়তে আসে, তখন তারা সেটার স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ অধিকাংশ সময়েই এই বিশাল সৃষ্টিজগতের সীমাহীন শৃঙ্খলা ও হারমোনির মাঝে তথাকথিত কিছু 'বিশৃঙ্খলা' খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করে।

তো, এবার তাদের জন্য ব্যাপারটা না হয় একটু সহজই করে দেওয়া যাক, না কি?

তো ব্যাপারটা হলো-

ভাতে থাকে স্টার্চ, হজমের সময় যা এনজাইমের প্রভাবে ভেঙে গ্লুকোজ নির্গত করে। এই এনজাইমের সিক্রেশন বা ক্ষরণ হয় শক্তির বিনিময়ে, অর্থাৎ গ্লুকোজ থেকে শক্তি পাওয়ার আগেই বেশ কিছু ইতোমধ্যেই শক্তি খরচ হয়ে গেল। এরপর সেই মুক্ত হওয়া গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে সারাদেহে পৌঁছাবে—আবার শক্তি খরচ। সেল বা কোষে শোষিত হতে ইনসুলিন লাগবে—যা ক্ষরিত হতে পুনরায় শক্তি 'খরচিত'। তারপর ইনসুলিন আসলে গ্লুকোজ কোষে শোষিত হবে—আবারও শক্তির ব্যয়। এরপর কোষের ভেতরে সেই গ্লুকোজ মেটাবোলাইজড অর্থাৎ বিপাক হবে, বিপুল সংখ্যক এনজাইম লাগবে—কথা কম, শক্তি দাও আগে।

কেবল শক্তি তৈরি করতেই ইতোমধ্যেই এভাবে শক্তি খরচ হতেই আছে, তার ওপর আবার অতিরিক্ত গ্লুকোজ অণুগুলো যখন যকৃত কোষে সঞ্চিত হবে, সেখানে তারা আবার পুনরায় পরস্পর যুক্ত হয়ে পলিমার গঠন করে গ্লাইকোজেন হিসেবে থাকবে, যেখানে আবার শক্তি লাগবে।

- 'ফাজলামো নাকি?!'

- 'কোনো মানে হয় এগুলার?!'

এমনিতেই শুরুর পলিমার স্টার্চ থেকে ভেঙে গ্লুকোজ পেতে এতকিছুর মধ্যে দিয়ে যাওয়া লাগল, আবার সেই পলিমারই (গ্লাইকোজেন) তৈরি করার মানেটা কী? কী, সহজ হয়ে গেল না স্বঘোষিত বিজ্ঞানীদের জন্য ব্যাপারটা?

দেহের কাজে যখন গ্লুকোজই লাগছে, তখন একবার সেটার পলিমার ভেঙে, আবারও সেই পলিমারই বানানোর মানে কী? এতে শক্তি অপচয় না করে গ্লুকোজ হিসেবে সঞ্চয় করলেই হলো। শুধু শুধু অনর্থক কাজ করাই কি প্রমাণ করে না, যে, 'স্রষ্টা বলে কিছু নেই, ওসব গুহাবাসীয় চিন্তাভাবনা?' কারণ, সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্যই তো যতটা সম্ভব কম শক্তি খরচে অধিক পরিমাণে কাজ করে শক্তি সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

এখন এই 'স্রষ্টার অনুপস্থিতির' স্বপক্ষে থাকা এই অতীব সহজবোধ্য, সাবলীল এবং কংক্রীটতুল্য 'যুক্তির' বিপরীতে 'গণ্ডমূর্খের মতো মধ্যযুগীয় কিছু ব্যাখ্যা' দিতে হলে অন্য একটা ব্যাপারে একটু মনোযোগ দিতে হবে।

তবে তা কোনো ব্যাপার না।

তো, এখন সেই উল্লেখিত ব্যাপারটা হলো অসমোলারিটি, শুদ্ধ বাংলায় বললে অভিস্রাব্যতা। ব্যাপারটা সহজে বলতে গেলে, ধরা যাক পানির একটা পাত্রের কথা—যার ঠিক মাঝখানে এমন একটা নেট বা ফিল্টার দেওয়া, যার ভেতর দিয়ে শুধুমাত্র পানি-ই যেতে পারবে, পানিতে মিশে থাকা বস্তু নয়। তো এখন সেই ফিল্টারের এক পাশে শুধু পানি কিংবা কোনো কিছু অল্প পরিমাণে মেশানো পানি, আর অপর পাশে পানির সাথে সেই বস্তু বেশি পরিমাণে মিশিয়ে রাখলে পানি ফিল্টারের কোন পাশ থেকে কোন পাশে যাবে, এবং কতটুকুই বা যাবে তা যেই ব্যাপারটা নির্ধারণ করে, তাই হলো অভিস্রাব্যতা। যেমন ধরুন, ডানে শুধু পানি অথবা কম সলিউট বা দ্রব মেশানো পানি, এবং বামে বেশি পরিমাণে দ্রব মেশানো পানি রাখা হলে পানির প্রবাহ হবে ডান থেকে বামে। অর্থাৎ, যেখানে পানির পরিমাণ বেশি সেখান থেকে পানি, যেখানে তার পরিমাণ কম সেখানে যেয়ে জমা হবে—যতক্ষণ না সবদিকে তা সমান হচ্ছে।
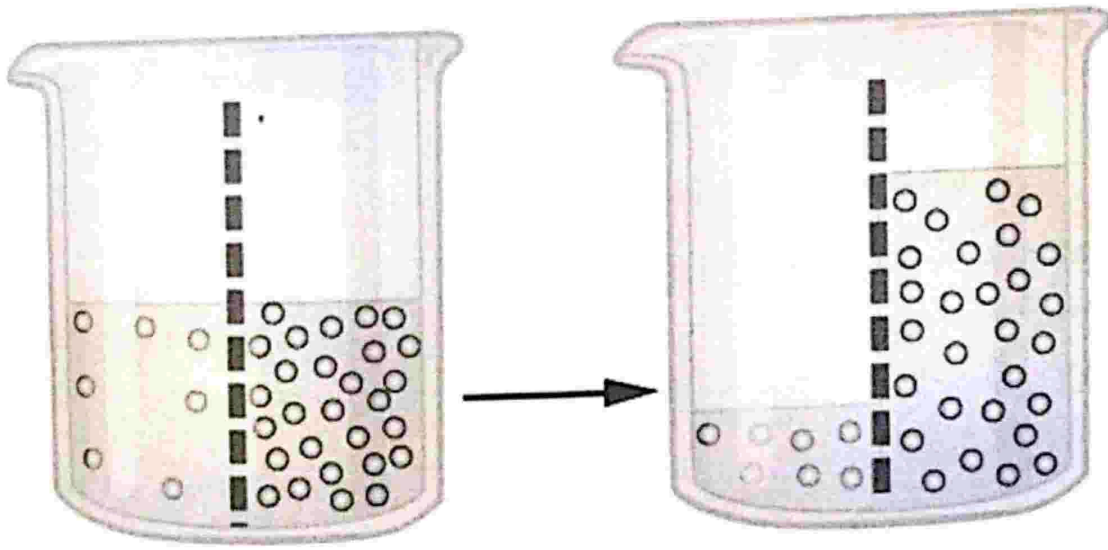
চিত্র : অভিস্রাব্যতা[১৭৩]

এখন কথা হলো, এই অসমোলারিটি বা অভিস্রাব্যতার একটা বড় অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। তা হলো, এটা দ্রবণে মিশ্রিত বস্তুর নাম্বার বা সংখ্যার ওপর নির্ভর করে–সে বস্তুর আকার, আয়তন, ওজন কিংবা ভর এগুলো কোনোটার ওপরই নির্ভর করে না।

[১৭৩] চিত্রের ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার – OpenStax - https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@8.25:fEI3C8Ot@10Version 8.25 from the TextbookOpenStax Anatomy and Physiology Published May 18, 2016, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64286562

অর্থাৎ, যদি কোনো ফিল্টারের ডানপাশের পানিতে ১০টি ছোট ছোট কণা মেশানো থাকে, এবং বামপাশে যদি সেগুলোর চেয়ে বড় কেবল একটা কণা থাকে, তাহলেও পানি বামপাশ থেকে ডানপাশেই যাবে, তার বিপরীত কখনোই নয়।

তো, এখন এই একই ব্যাপার সেল বা কোষের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যাক—যার ঝিল্লির ভেতরের অংশও জলীয়, এবং বাইরের অংশও জলীয়। কোষে যদি গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনরূপে জমা না হয়ে শুধু গ্লুকোজরূপেই জমা হতো, যার বাইরে গ্লুকোজের ঘনত্ব কম, সেক্ষেত্রে কী হতো?

ধরা যাক, একটা গ্লাইকোজেন ড্রপলেট বা দানায় ৫টি গ্লুকোজ অণু আছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, যদি কোনো কোষে এই গ্লাইকোজেন দানাটি থাকে,তাহলে কি কোষটি বাইরে থেকে ভেতরে পানি বেশি ঢোকার ফলে কোষটি রাপচার হবে বা ফেটে যাবে; না কি তার বদলে এই ৫টি গ্লুকোজ অণু থাকলে তা বেশি পানি ঢোকার ফলে সহজে ফেটে যাবে?

উপরিউক্ত আলোচনা বুঝে থাকলে জবাবের তিরটা অবশ্যই ২য় ক্ষেত্রের দিকে, অর্থাৎ ৫টি গ্লুকোজ অণুর দিকে যাবে। তাহলে অস্তিত্বই যেখানে হুমকির মুখে সেখানে শক্তি সংরক্ষণ করা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ, না কি শক্তি খরচ করে প্রাণ বাঁচানোই অধিক জ্ঞানের পরিচয়?

তো, এখন দেশের বিজ্ঞানের ঠিকাদারেরা মুখ ভোঁতা করে হয়তো বলতে পারে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম যে শক্তি বাঁচানোর চেয়ে প্রাণ বাঁচানো বেশি দরকারি। কিন্তু সেটাও তো বাধ্য হয়ে নিজে থেকেই হতে পারে, কারণ তা না হলে সে কোষের কার্যক্রমই হবে না।'

অতীব 'সুন্দর' যুক্তি।

তবে জবাবের আশা করার আগে তাদেরকে একটু পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ থেকে ঘুরে আসার জন্য। তবে কেবল গেলাম আর বাতাস খেয়ে চলে আসলাম উদ্দেশ্যে না, কিছু জিনিস জানার উদ্দেশ্যে। যেকোনো কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রকে আপনি বলে দেখেন—

'এই যে আপনার হাতে এই কম্পিউটারটি—এটি তো আপনার বাংলা বা ইংরেজি, কিংবা অন্য কোনো ভাষায় ইনপুট করা তথ্য বুঝতে পারে না, তার বুঝার জন্য সেগুলোকে বাইনারি কোডে রূপান্তরিত হতে হয়।

যেহেতু কম্পিউটারটি আপনার ইনপুট করা তথ্য বা ইনফরমেশন বুঝতে পারে না, আর বুঝতে না পারলে যেহেতু তার কার্যক্রমই চলতে পারবে না; কাজেই বোঝা যায়

যে, এই কম্পিউটারটি নিজে থেকেই তার কাজের সুবিধার জন্য এই মেকানিজমটি ডেভেলাপ করেছে, এর কোনো স্রষ্টা নেই।'

উপরিউক্ত কথা বলার পর যদি আপনাকে সুন্দরমতো কোনো মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার আয়োজন শুরু না হয়ে থাকে, তাহলেই বুঝবেন যে আপনার এই 'যুগান্তকারী' যুক্তিটি একেবারে অব্যর্থ। কারণ আপনি একজন কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রকে যে 'যুক্তি' দেখালেন, সে ছাত্র জানে যে তা কখনোই সম্ভবপর নয়। কারণ সে জানে যে, একটি কম্পিউটারের নিজের কোনোই বুঝ নেই, নিজের ভালোমন্দের সেটার কোনো চেতনা নেই যে, সেটি নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে আপনা-আপনিই কোনো পদ্ধতি বা মেকানিজম ডেভেলাপ করতে পারে। সে বস্তুটি তো শুধুমাত্র সেসমস্ত কাজই করতে পারে, যা করার জন্য সে ইতোমধ্যেই কোনো একজন বুদ্ধিমান সত্তা দ্বারা প্রোগ্রামকৃত হয়ে আছে।

তাহলে একটি জীবকোষ—যার কোনো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট নেই, কোনো কনশাসনেস বা চেতনা নেই, ভালোমন্দের কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই—সেটি কী করে নিজেকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে নিজে থেকেই কোনো মেকানিজম তৈরি করতে পারে?

কী জবাব হতে পারে এ প্রশ্নের—

একমাত্র-কোনো উচ্চতর, বুদ্ধিসম্পন্ন মহান সত্তা দ্বারা আগে থেকে প্রোগ্রামকৃত হওয়া—এই ব্যাখ্যা ছাড়া?

আসলে ব্যাপারটা হলো, চক্ষুদানে দৃষ্টিক্ষম করে তোলার চেষ্টা অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নিজের চোখ নিজেই খুলে ফ্রিজে রেখে দেওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে না।

যাই হোক, ভিন্ন একটা ব্যাপারে আসি।

এতক্ষণ তো গেল একবার খাওয়া পলিমার এত কষ্ট করে ভেঙে, আবারও সেই পলিমার হিসেবেই তৈরি করে দেহে জমা রাখার পেছনের একটা কথা, এবার আরও কিছু কথা জানার চেষ্টা করা যাক ইন শা আল্লাহ। দেখা তো গেল যে, অসমোলারিটি বা অভিস্রাব্যতা নামক বস্তুর কারণে রাপচার হওয়া থেকে রক্ষা পেতে কোষে উপোরিল্লিখিত মেকানিজম অনুসৃত হয়। কিন্তু মনোমার হিসেবে গ্লুকোজ সঞ্চিত না করে, পলিমার হিসবে গ্লাইকোজেনরূপে তা সঞ্চিত করার পেছনে যে সেই অভিস্রাব্যতার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে কী ধরনের অসামান্য ডিজাইন রয়ে গেছে—সেটা? পূর্বের কিছু আলোচনা থেকে তো এটা জানা গেল যে, অসমোলারিটি বা সহজ ভাষায় কোনো ফিল্টারের মধ্য দিয়ে জলীয় পদার্থের প্রবাহ নির্ভর করে তাতে

মিশে থাকা দ্রবের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে, সেগুলোর অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য যেমন ভর কিংবা আয়তন ইত্যাদি কোনোকিছুর ওপরই নির্ভর করে না। এখন ধরা যাক এমন একটি কোষের কথা কল্পনা করা যাক, যার সলিউট বা দ্রব ধারণ ক্ষমতা ১০০টি। অর্থাৎ সে কোষটির ঝিল্লির বাইরের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে রাপচার হওয়া থেকে বাঁচতে হলে সর্বোচ্চ ১০০টি সলিউট সেটির ভেতর থাকতে পারবে, এর বেশি সেটি পারবে না। অর্থাৎ ১০০টির জায়গায় ১০১ কিংবা ১০২টি দ্রব সেটির ভেতরে হলেই অতিরিক্ত পানি বাহির থেকে ভেতরে ঢোকা শুরু করবে, এবং একসময় ফলাফল হবে রাপচার।

উপরিউক্ত এ কোষটি তাহলে কী করে দেহের শক্তিচাহিদা পূরণ করবে? জমিয়ে রাখা মাত্র ১০০টি গ্লুকোজ অণু টান পড়লে তো মুহূর্তের মধ্যেই নাই হয়ে যাবে, তারপর? তাহলে তো শুধুমাত্র বেঁচে থাকতে হলেই আর সব কাজ ফেলে কিছুক্ষণ পরপর টানা খেয়েই যেতে হবে, আর এ করতে করতেই জীবন পার হয়ে যাবে।

তাহলে উপায়?

আচ্ছা, এবার তাহলে আরেকটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক যেখানে যাবতীয় অবস্থা একই। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও একটি কোষের দ্রব ধারণ ক্ষমতা সেই ১০০টি-ই। কিন্তু এবার একটু পার্থক্য আছে, আর তা হলো এবারে স্টোরেজ হিসেবে মনোমাররূপে গ্লুকোজ অণু না রেখে পলিমাররূপে গ্লাইকোজেন হিসেবে রাখা হলো। তাহলে গ্লাইকোজেন ড্রপলেট বা দানাও সর্বোচ্চ সেই ১০০টিই থাকতে পারবে।

কিন্তু মজাটা হলো এখানেই।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, প্রত্যেকটি গ্লাইকোজেন দানায় অন্তত ১০০০টি করে গ্লুকোজ অণু আছে, তাহলেও পুরো কোষে সঞ্চিত অবস্থায় মোট (১০০ x ১০০০) অর্থাৎ ১০০,০০০টি গ্লুকোজ অণু পাওয়া যাবে—যা পূর্বের তুলনায় ১০০০ গুণ বেশি।

আমরা কি অনুভব করতে পারছি এখানে কী অসাধারণ এক ডিজাইন লুকিয়ে আছে?

কেবলমাত্র কাল্পনিক এক দৃশ্যতেই যেখানে ১০০টির বেশি গ্লুকোজ অণু থাকলে একটি কোষ রাপচার হয়ে যাচ্ছে, সেখানে শুধু এক পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে তার চেয়েও অন্তত ১০০০ গুণ বেশি গ্লুকোজ অণু গচ্ছিত রাখা যাচ্ছে কোষটির কোনো ক্ষতিই না করে, যা বাস্তবের ডেটায় দেখতে গেলে জানা যাবে যে, প্রকৃত পরিমাণটা তার চেয়েও কত লক্ষ-কোটিগুণ বিশাল। আর এ তো গেল ছোট্ট এক মানবদেহের অভ্যন্তরের কোটি কোটি মিরাকলের মাত্র সামান্য দুই-একটি, এর বাহিরে যে

বিশাল অন্তহীন বিশ্বজগৎ পড়েই রয়েছে। এরপরেও কিছু মানসিক বিকারগ্রস্থ বলে বেড়ায় যে, বিশ্বজগত স্রষ্টাহীন, তা নিজে থেকেই স্রষ্টি হয়েছে। তারা বলে বেড়ায়, সৃষ্টিজগতের তৈরির সাথে 'আল-খালিক' নামের কোনো সম্পর্কই নেই। আহ, কত 'রসালোই' না সেসব কথা! কত 'মুক্তমন-ই' না তাদের! ঠিক কতখানি 'চোখ থাকিতে অন্ধ' এবং 'মানসিকভাবে অপ্রকৃতিতস্থ' হলে যে এমন এমন আশ্চর্যজনক সব কাজকারবার ঘটানো সম্ভবপর হয় তা এই অধমের ধারণারও বাইরে।

কাজেই খুঁজুন আপনার পালনকর্তার নির্দশন আপনার চারপাশে, উপলব্ধি করুন তাঁর নির্দশন আপনারই মাঝে।[১৭৪] জানুন যে, এই সীমাহীন বিশ্বজগৎ আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়নি।[১৭৫] অতএব চিন্তা করুন, মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হোন।

[১৭৪] 'অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা?' [সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫৩]
'তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখো, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।' [সূরা মুলক, ৬৭ : ৩-৪]

[১৭৫] 'তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।' [সূরা তূর, ৫২ : ৩৫-৩৬]

ইসলামি সভ্যতা কেন সর্বশ্রেষ্ঠ?

আসিফ আদনান

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সাথে ইসলামের বোঝাপড়া নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়। এ ধরনের লেখার সাধারণত দুটো ফোকাস থাকে। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার বিভিন্ন অসঙ্গতি এবং এর অন্ধকার ইতিহাস তুলে ধরা, আর ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। এ জাতীয় লেখা অনেক দিন ধরেই হচ্ছে, তবে বছর খানেক ধরে এ বিষয়ে আগ্রহ কিছুটা বেড়েছে। এটা ভালো দিক। হীনমন্যতাবোধ কাটাতে না পারলে উম্মাহর পুনঃজাগরণ এবং বিজয় সম্ভব না। তবে ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে লেখকরা যেভাবে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, সেটা নিয়ে আরেকটু চিন্তাভাবনা করা দরকার।

ইসলামি সভ্যতা কেন শ্রেষ্ঠ, তা প্রমাণে কয়েকটা ধরাবাঁধা যুক্তি ব্যবহার করা হয়—

- কুরআনের বৈজ্ঞানিক মিরাকল। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে মিলে গেছে, যা থেকে প্রমাণ হয় কুরআন সত্য, ইত্যাদি।
- মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান। মুসলিম বিজ্ঞানীদের রচনাবলী থেকে পশ্চিমারা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু তারা ক্রেডিট দেয়নি। ইউরোপের অনেক আগেই মুসলিম বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন, ইত্যাদি।
- ইসলামি সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন স্থানের সাথে মধ্যযুগের ইউরোপের তুলনা। যেমন : বাগদাদ, কর্ডোভা, ইসতাম্বুল। ইউরোপে যখন মানুষ গোসল করত না, অমুক শহরে তখন উৎকৃষ্ট মানের পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা ছিল।

- ইসলামি স্বর্ণযুগ। যেটাকে মধ্যযুগ বলা হয়, সেটা ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। মধ্যযুগ ইউরোপের জন্য অন্ধকার হতে পারে। মুসলিমদের জন্য না। পশ্চিমা ঐতিহাসিকরাও এটা স্বীকার করেছে। বাগদাদকে ইসলামি স্বর্ণযুগের কেন্দ্র বলেছে ইত্যাদি।
- ইউরোপ মানবাধিকারের ধারণা আবিষ্কারের আগেই মুসলিমরা মানবাধিকার সম্পর্কে জানে। ইসলাম প্রথম নারীকে অধিকার দিয়েছে, সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়েছে ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য এবং ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে লেখেন, কিন্তু ওপরের যুক্তিগুলো ব্যবহার করেননি, এমন লেখক খুঁজে পাওয়া কঠিন। খুঁজে দেখলাম, ইসলামি স্বর্ণযুগ আর ইউরোপের মধ্যযুগ নিয়ে পয়েন্টটা আমি নিজেও কমপক্ষে দুই জায়গাতে লিখেছি। যদিও এই যুক্তিগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্য এবং এর পেছনে সেন্টিমেন্ট প্রশংসনীয়, তবে এ ধরনের আলোচনাতে পাশ্চাত্যের বেঁধে দেয়া ফ্রেইমওয়ার্কে নিজের অজান্তেই আমরা আটকা পড়ে যাচ্ছি কি না, সেটা একটু ভাবা দরকার।

ওপরের প্রতিটা যুক্তিতে কী দিয়ে 'সভ্যতা' প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে? সভ্যতা মাপার মাপকাঠিগুলো কী কী?

- বিজ্ঞান
- জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
- প্রযুক্তি বা বস্তুগত অগ্রগতি
- অর্থ, বাণিজ্য, জীবনযাত্রার মান
- অধিকার

অর্থাৎ, ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আমরা ওপরের মাপকাঠিগুলো ব্যবহার করছি। নিঃসন্দেহে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বস্তুবাদী অর্জন, জীবনযাত্রার মান, এবং পশ্চিমা সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তি অধিকার সভ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু এগুলোই কি সভ্যতার একমাত্র পরিচায়ক? আধুনিক পশ্চিমের সাথে ইসলামের মৌলিক একটা পার্থক্য লুকিয়ে আছে এ প্রশ্নের উত্তরে। আধুনিক পশ্চিম এগুলোকেই সভ্যতার মাপকাঠি মনে করে। কিন্তু ইসলামের সভ্যতার ধারণা এই চলকগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না। ইনফ্যাক্ট, শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ওপরের কোনোটিকেই ইসলামে গ্রহণ করা হয় না।

আধুনিক পশ্চিম বলে মানবসভ্যতার রেখাচিত্র সময়ের সাথে ঊর্ধ্বমুখী। যত সময় যাচ্ছে তত মানুষের অগ্রগতি হচ্ছে। এই অগ্রগতি সামগ্রিক। জ্ঞানবিজ্ঞান, মানবতা, নৈতিকতা, প্রযুক্তি; অগ্রগতি হচ্ছে সব দিকে। যত সময় যাবে মানুষ তত উন্নত হবে।

সবসময়, গতকালের চেয়ে আগামীর মানুষ শ্রেষ্ঠ হবে। কিন্তু ইসলাম থেকে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো শিক্ষা পাই। ইসলাম থেকে আমরা জানি, নবি ﷺ-এর ওফাতের পর থেকে মানবসভ্যতার রেখাচিত্র সময়ের সাথে নিম্নমুখী। সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে সভ্য, সবচেয়ে নৈতিক, সবচেয়ে পরিপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ছিল নবি ﷺ-এর প্রজন্ম। তারপর থেকে ক্রমাগত অবস্থার অবনতি হচ্ছে, এবং কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত এই অবস্থা চলবে। নবি ﷺ বলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম তাঁর প্রজন্ম, অর্থাৎ সাহাবিদের (রদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রজন্ম। তারপর তাবিয়িদের প্রজন্ম। তারপর তাবি-তাবিয়িদের প্রজন্ম। প্রত্যেক শুক্রবারে জুমুআহর খুতবা-তে আমরা এ কথাটা শুনি। এই হাদীস থেকে সভ্যতা, শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা আমরা পাই। কিন্তু অভ্যস্ততার কারণেই হয়তো, আমরা কথাটাকে যথাযথ গুরুত্ব দিই না।

নবি ﷺ-এর প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ কেন? সাহাবিদের মধ্যে তো বিশ্বখ্যাত কোনো বিজ্ঞানী ছিল না। সাহাবিদের অধিকাংশকেই শিক্ষিত বলা যায় না। লিখতে-পড়তে জানা সাহাবির সংখ্যা বেশ কম ছিল, রদিয়াল্লাহু আনহুম। প্রযুক্তির দিক থেকে বর্তমানের সাথে তো তুলনাই চলে না। জীবনমানের দিক থেকে পারস্য আর বাইযেন্টাইন ছিল সমৃদ্ধ। মদীনার অবস্থা ছিল শোচনীয়। খোদ নবি ﷺ দিনের পর দিন অভুক্ত থেকেছেন। ঘুমিয়েছেন খেজুর পাতার পাটিতে। আর যে অর্থে আমরা আজকে 'অধিকার' এর কথা বলি, সেই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মদীনাতে তো 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' হতো। আধুনিক লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালে ব্যক্তি-অধিকার, নারী অধিকার, সাম্য, মানবতা অনেক কিছুই মদীনাতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আব্বাসী খিলাফাতের অধীনস্ত বাগদাদ, উমাইয়্যাদের অধীনস্ত আন্দালুস কিংবা উসমানীদের ইস্তামবুলের সাথেও তো এই মাপকাঠিগুলোর দিক থেকে মদীনার তুলনা করা যায় না।

জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থ-বাণিজ্য, জীবনযাত্রার মান, বস্তুবাদী সুবিধা, আধুনিক অধিকারের আলাপ—কোনো দিক থেকেই মদীনাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। কিন্তু তবুও নবি ﷺ-এর প্রজন্মই কেন শ্রেষ্ঠ? যদি এগুলোই সভ্যতার প্রধান মাপকাঠি হয়, তাহলে সাহাবিদের (রদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ কীভাবে? শুধু এক ভাবেই এই প্রজন্মকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। যদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি অন্য কিছু হয়। সেই অন্য কিছুটা কী?

বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ তাওহীদের জ্ঞান এবং বাস্তবায়ন। কুরআন-সুন্নাহর ইলম। ইসলামি শারীয়াহর শাসন। কুরআনের শিক্ষা এবং নববি সুন্নাহর অবিকৃত, বিশুদ্ধতম অনুসরণ। তাকওয়া, তাসাউফ, যুহদ, তাওয়াক্কুল। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি এগুলো। ইসলামি সভ্যতার ধারণার কেন্দ্রে আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো। জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তির মতো চলকগুলো সভ্যতার গৌণ বৈশিষ্ট্য হতে পারে। এগুলোর দরকারও

আছে। কিন্তু এগুলো সভ্যতার এবং শ্রেষ্ঠতার মৌলিক চলক না।

কিন্তু আমরা যখন ক্রমাগত জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অধিকার, জীবনযাত্রার মানের মতো মাপকাঠিগুলো দিয়ে ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে যাই, তখন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। সভ্যতার আধুনিক পশ্চিমা ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করে নিই। নিজস্ব ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে বোঝার চেষ্টা করি সেই লেন্সের ভেতরে। আবার উম্মাহর পুনঃজাগরণকেও আমরা এই মাপকাঠিগুলোর বেঁধে দেয়া ছকের ভেতর চিন্তা করি। তাই ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর বদলে ইবনে সিনাকে দিয়ে আমাদের 'শ্রেষ্ঠত্ব' প্রমাণের চেষ্টা করতে হয়।

অসংখ্য ইসলামি বুদ্ধিজীবি, আন্দোলন এবং দলকে আমরা বলতে দেখি, ইসলামের বিজয় আসবে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতির মাধ্যমে। ক্যারিয়ার বানিয়ে। ইসলামের সৌন্দর্য দিয়ে কাফিরদের মুগ্ধ করে দিয়ে, অমুক সংখ্যক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে, অ্যাকাডেমিয়াতে ঢুকে 'রেভ্যুলুশান' করে ফেলে, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্যে ইসলামি রেনেসাঁর মাধ্যমে, কিংবা ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে। ইসলামি শারীয়াহর ব্যাপারে জ্ঞানতাত্ত্বিক আমূল পরিবর্তন এনে...। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ, সেগুলোর কথা আমরা ভাবি না। পুনঃজাগরণ এবং বিজয়ের পথ হিসেবে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের কথা ভাবি না। ভাবলেও সেটাকে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য মনে করি না।

আমরা সভ্যতার যে মাপকাঠিগুলো নিয়েছি, সেগুলো অনুযায়ীই উম্মাহর পুনঃজাগরণের কথা ভাবছি। আমার সীমিত বোধবুদ্ধিতে মনে হয়, যদি আমরা উম্মাহর পুনঃজাগরণ চাই, নবি ﷺ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই অর্থে শ্রেষ্ঠ হতে চাই, তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের মৌলিক মাপকাঠিগুলোর ওপর জোর দেয়া দরকার। আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন, আমাদের ইমাম আহমাদকে দরকার না কি ইবনে সিনাকে। ফারাবি আর আল-কিন্দিকে দরকার না কি ক্বাক্বা আর খালিদ (রদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে।